আগস্ট 1987

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

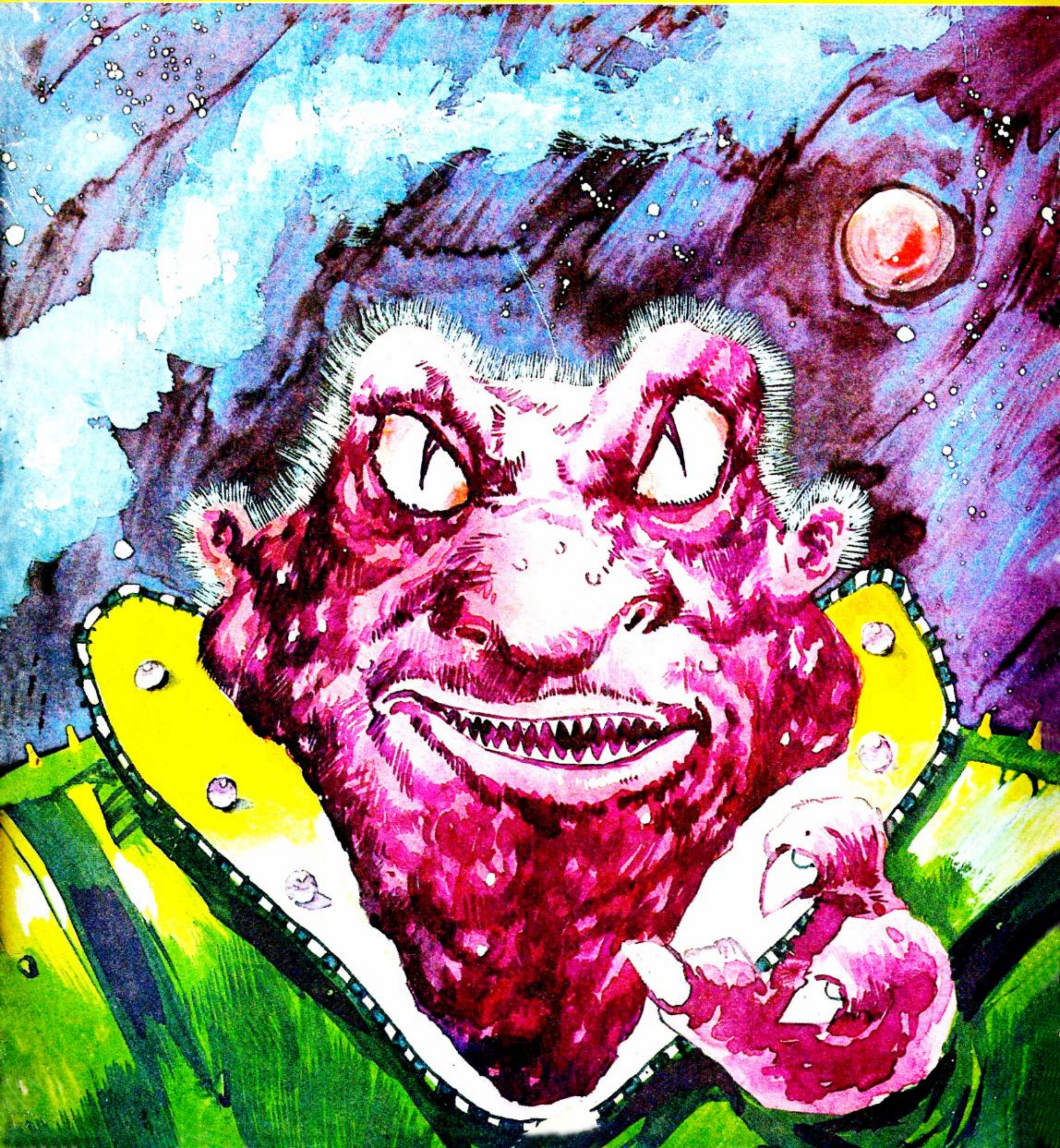

কিশোর রচনাবলী

জগদীশচন্দ্র বসু ॥ কিশোর রচনা সমগ্র ২৫্

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

কিশোর রচনা সমগ্র ৩০্

প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥

শার্লক হোমস্ কিশোর সমগ্র ২৫্

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ॥ রোমাঞ্চকর ২৫

মেঘনাদ সাহা ॥ কিশোর রচনা সঙ্কলন ১২্

ভ্রমণ ও অভিযান

সুনির্মল বসু ॥ রোমাঞ্চের দেশে ৬্

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

সুন্দরবনে সাত বৎসর ১০্

ধীরেন্দ্রলাল চক্রবর্তী ॥ দুরন্ত যাত্রী ৮্

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ॥ গঙ্গা যমুনা ৮্

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ॥

আমাজনের অরণ্যে ৮্

সুনির্মল রায় ॥ চাঁদের পাড়ি ৮্

দেবব্রত চক্রবর্তী ॥ চক্রতীর্থের চমক ১০

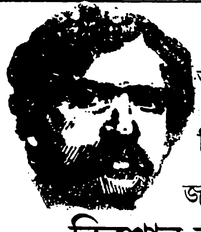

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর গল্প প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী ও চিঠিপত্রের মূল্যবান সঙ্কলন

জগদীশচন্দ্র বসু

কিশোর রচনা সমগ্র ২৫্

কিশোর ক্লাসিকস্

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ তেপান্তর ২০্

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ কিশোর অপু ২৫্

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্দীপন পাঠশালা ১০্

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ছোটদের কাজল ১০্

প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ ঘনাদা বিচিত্রা ২৫্

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

টেনিদার অভিযান ২৫্

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ বাঙলার ডাকাত ২৮্

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অপুর ছেলেবেলা ১০্

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটদের অপরাজিত ১০্

বুদ্ধি ও মেধা চর্চার জন্য

অমরনাথ রায় ॥ নলেজ ক্যুইজ ১০

অরূপরতন ভট্টাচার্য ॥ গণিত ক্যুইজ ১০্

অমরনাথ রায় ॥ সায়েন্স ক্যুইজ ১০্

অলক চক্রবর্তী ॥ ফিজিক্স ক্যুইজ ১০্

অমরনাথ রায় ॥ কেমিস্ট্রী ক্যুইজ ১০্

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প

লীলা মজুমদার ॥ কল্পবিজ্ঞানের গল্প ১৫্

ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য ॥ লুপ্তধন ৮্

ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য ॥ মেঘনাদ ১০্

অদ্রীশ বর্ধন ॥ কিশোর সায়েন্স ফিকশন ১৫্

ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য

তুষারলোকের রহস্য ৮্

কারিগরী বিদ্যার প্রথম পাঠ

সহজ সরল ব্যাখ্যাসহ প্রায় অর্দ্ধশত মডেলের সচিত্র নির্মাণ প্রণালী

জয়ন্ত দত্ত সঙ্কলিত

নিজে নিজে কর ১০্

সচিত্র জ্ঞানবিজ্ঞান

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ॥ বিচিত্র বিজ্ঞান ৮্

অরূপরতন ভট্টাচার্য ॥ যুক্তিতর্ক হেঁয়ালি ৮্

বিমান বসু ॥ গ্রহ পরিচয় ১২

পার্থসারথি চক্রবর্তী

মাটি থেকে আকাশে ১০্

অমরনাথ রায় ॥ সংখ্যা নিয়ে খেলা ৮্

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

বিজ্ঞানেরআকস্মিকআবিষ্কার ৮্

অমরনাথ রায়

জ্ঞানবিজ্ঞানের মজার খেলা ১০্

সাধন দাসগুপ্ত ॥ আলো আরও আলো ১৫্

সাধন দাসগুপ্ত ॥ রোমাঞ্চকর রসায়ণ ১২

সাধন দাসগুপ্ত ॥ ভাষা গণিত ২০্

সিদ্ধার্থ ঘোষ

অঙ্কের ম্যাজিক খেলার লজিক ১৫্

স্যাম লয়েড ও লুইস ক্যারোলের ধাঁধা ১০্

অ্যালগীর কাহিনী

সুকন্যা ভট্টাচার্য

অ্যালগী শব্দটির সঙ্গে আমরা প্রায় সকলেই অল্প-বিস্তর পরিচিত। 1753 সালে অ্যালগী শব্দটি প্রবর্তন করেছিলেন একজন বিজ্ঞানী।—তাঁর নাম ছিল 'লিনিয়াস'। লিনিয়াস কিন্তু অ্যালগী বলতে বুঝেছিলেন শ্যাওলা, বা ঐ জাতীয় সমস্ত উদ্ভিদ্‌কেই। কিন্তু শব্দটির একটি নতুন সংজ্ঞা পাওয়া গিয়েছিল 'জুসিও' নামের একজন উদ্ভিদতত্ত্ববিদের বিশ্লেষণে। অ্যালগী বলতে তিনি বোঝালেন এক বিশেষ জাতের উদ্ভিদ্‌কে যাদের প্রত্যেকটিরই আছে নিজস্ব বাসস্থান, নিজস্ব আকার এবং একটা না একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং যাদের বেশির ভাগই খুব ছোট্ট।

উদ্ভিদ্‌বিদ্যার যে শাখাটি অ্যালগী বিষয়ক গবেষণার সঙ্গে জড়িত তার নাম হল 'ফাইকোলজি' আর যে সব বিজ্ঞানী অ্যালগী সম্বন্ধে গবেষণা করেন তাঁদের বলা হয়—'ফাইকোলজিস্ট'। অ্যালগীকে ছোট্ট বলেছি, তাই বলে সব অ্যালগীই কিন্তু চেহারায় ছোট্ট নয়। কিছু কিছু অ্যালগী আবার আকারে বেশ বড়। অমশ্য ক্ল্যামাইডোমোনাস, ভলভক্স ইত্যাদি অ্যালগীগুলো এত ছোট যে খালি চোখে তাদেরকে দেখা সম্ভব নয়। তবে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে এদের আসল চেহারা স্পষ্ট ধরা পড়ে। কিছু অ্যালগী,—যেমন ফিউকাস্, ল্যামিন্যারিয়া ইত্যাদি আবার তেমনি খুব বড় হয়। অ্যাসিটাবুল্যারিয়া এক প্রকাণ্ড সাইজের অ্যালগী।

বিজ্ঞানীরা নানা গবেষণা ও পরীক্ষানিরীক্ষা করে দেখেছেন যে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীদের জীবনে এই অ্যালগীর মূল্য অসামান্য।

অ্যালগীর উপকারিতা আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে বিভিন্ন ধরনের অ্যালগীর বিভিন্ন রকম খাদ্যগুণ। যেমন 'স্পাইরোগাইরা' আর 'আলভা' শুকিয়ে ছোট প্যাকেট করে বিক্রী হয় বাজারে বাজার। এইগুলি দিয়ে 'সুপ' বানালে খুব সুস্বাদু খাবার তৈরি হয়। ব্রেজিলে 'নস্টক কলোনী' সিদ্ধ করে এক রকমের খাবার বানানো হয়। জাপানেও বানানো হয় 'ল্যামিন্যারিয়ার স্টাইপ' দিয়ে 'কোম্বু' বলে এক সুস্বাদু খাবার। পশ্চিম ইউরোপে 'আইরিশ মস্' বা ক্যারাঘীনের চাষ হয়। এই অ্যালগীটা দুধের সঙ্গে অথবা ভ্যানিলা-যুক্ত ফলের সঙ্গে মিশিয়ে ব্ল্যাংকস্যাঞ্জ বলে এক জনপ্রিয় খাবার তৈরি করা হয়। এক ধরনের অ্যালগীর নাম হল 'ক্লোরেলা'। কচি অবস্থায় এই উদ্ভিদ্‌কে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে তার মধ্যে যে ভিটামিন সি আছে তা লেবুর রসের ভিটামিনের সমান।

খাবার হিসাবে অ্যালগীর উপকারিতার কথা বাদ দিলেও অন্যান্য আরও অনেক ক্ষেত্রে অ্যালগীর উপকারিতা স্বীকার না করে চলে না। তেমনি একটি ক্ষেত্র হল মাছের চাষ। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যও আজকাল কিছু কিছু অ্যালগীর ব্যবহার করা হচ্ছে। ছোট জাতের অ্যালগী খেয়ে তেলাপিয়া মাছের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে। মাছগুলিও হয়েছে বেশ পুষ্ট।

শিল্পের ক্ষেত্রেও অ্যালগীর অবদান বড় কম নয়। 'আগর আগর' হল একটি মূল্যবান্ জিনিস। এটি পাওয়া গেছে এক ধরনের লাল অ্যালগী থেকে—যেমন জেলিডিয়াম্, অথবা গ্র্যাসিলারিয়া। আগর—আগরের অনেকগুলি উপকারিতা রয়েছে। তাদের মধ্যে যেগুলির বেশি উপকারিতা রয়েছে। তাদের মধ্যে যেগুলি বেশি উল্লেখযোগ্য সেগুলিই করা যাক। যেমন ওষুধ তৈরির ক্ষেত্রে জিনিসটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। গবেষণাগারে জীবাণু বা ফাংগাসের চর্চার কাজে জিনিসটা মাধ্যম অর্থাৎ মিডিয়াম হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। কখনও কখনও সুস্বাদু খাবারও তৈরি করা হয় জিনিসটি দিয়ে—দুধের সঙ্গে একটু চিনি মিশিয়ে জ্বাল দিলে দুধটা জমে যায়। সেই জমাট দুধ বর্ফির মত কেটে নিলে দেখা যাবে সে এক লোভনীয় সামগ্রী। তা ছাড়া প্রসাধন, চর্ম এবং বস্ত্র-শিল্পেও আজকাল ব্যবহার করা হচ্ছে এই আগর আগর।

কিছু কিছু সামুদ্রিক উদ্ভিদ্ থেকে এক ধরনের অ্যাসিড উদ্ধার করা হয়—যার নাম 'অ্যালগিনিক অ্যাসিড'। লেসোনিয়া অ্যাস্কোফাইলাম ইত্যাদি কিছু কিছু অ্যালগী থেকে এই অ্যাসিড সংগ্রহ করা যায়। অ্যালগিনিক অ্যাসিড খাবার তৈরির শিল্পে, বস্ত্র এবং প্লাস্টিক তৈরির শিল্পে প্রয়োজনীয় উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়। 'ব্যাসিলারিওফাইটা' জাতের এক ধরনের অ্যালগী থেকে 'ডায়াটমিট্' সংগ্রহ করা যায়। ডায়াটমিট্‌কে এক ধরনের পাথরের মত স্তূপ বলা যেতে পারে। তার থেকে এক

সপ্তম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা
আগস্ট 1987

আগামী সংখ্যায়

বিশেষ রচনা

সূর্য ঃ অফুরন্ত শক্তির উৎস

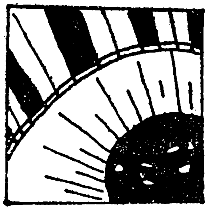

লিখবেন ঃ
সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র

প্রধান সম্পাদক ॥ সমরজিৎ কর
সম্পাদক ॥ রবীন বল
সহ সম্পাদক ॥ জয়ন্ত দত্ত

সূচীপত্র

চিঠিপত্র ঃ 4 : কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর ঃ ভিন গ্রহে প্রাণী ॥ সমরজিৎ কর 7

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প ঃ যে যন্ত্রটি যুদ্ধ জয় করেছিল (আইজ্যাক অ্যাসিমভ) ॥ অনু ঃ সৌরেন ভট্টাচার্য 19 ঃ আলোক রহস্য ॥ চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত 35

বিশেষ রচনা ঃ ভিনগ্রহে কি বুদ্ধিমান প্রাণী আছে ॥ অদ্রীশ বর্ধন 9

পড়াশোনা ঃ বেরিলিয়াম ॥ অমরনাথ রায় 15 ঃ সালোকসংশ্লেষ কয়েকটি প্রশ্ন ॥ অশোক কুমার গায়েন 17 ঃ অ্যাপোলোনিয়াস উপপাদ্য ও যাদুবর্গ ॥ গোপাল চক্রবর্তী 53

জ্ঞান বিজ্ঞানের রচনা ঃ জ্ঞান বিজ্ঞানের বই ॥ সুধাংশু পাত্র 29 ঃ বিজ্ঞান সংবাদ 10

পরিবেশ ও আমরা ঃ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে মেঘতত্ত্ব ॥ শচীনন্দন আঢ্য 38 ঃ যদি বাতাস না থাকতো ॥ নিত্যগোপাল বসু 51

ব্রহ্মাণ্ডের খবর ঃ কি করে জানব নক্ষত্রের উপাদান ঃ শঙ্কর সেনগুপ্ত 49

ছড়া ঃ সূর্য ধরা কল ॥ সুবোধ কুমার রায় 37

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী ঃ কৃতীবিজ্ঞানী নীলরতন ধর ॥ ছন্দোময় মণ্ডল 54 ভেইন বাপু টেলিস্কোপ ॥ জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য 47 ঃ পক্ষিবিজ্ঞানী সালিম আলি ॥ অজয় হোম 6

পৃথিবী ও সম্পদ ঃ অ্যালগীর কাহিনী ॥ সুকন্যা ভট্টাচার্য 27

আবিষ্কারের গল্প ঃ ফ্রিজ ॥ অলয় ঘোষাল ও ঋতুপর্ণ ঘোষ 58

শরীর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞান ঃ পণ্ডিত মধুসুদন গুপ্ত ॥ দিবাকর সেন 30

ইলেক্‌ট্রনিক্‌স-এর কলা-কৌশল ঃ ইলেক্‌ট্রনিক্‌স-এর কথা ॥ বিপ্লব ব্যানার্জী 39

ধারাবাহিক রচনা ঃ নরবানরের গ্রহে ॥ অদ্রীশ বর্ধন 31
বিজ্ঞানের ডায়েরী বিমান বসু 63

ছবিতে গল্প ঃ প্রাণী বিচিত্রা ॥ শৈল চক্রবর্তী 11 ঃ আবিষ্কারক কলম্বাস ॥ গৌতম কর্মকার 12 ঃ ড্যামসেল ফ্লাই ॥ ঋতিংকর দত্ত 14 ঃ বুদ্ধিশুদ্ধি ॥ সমীর মণ্ডল 55 ঃ খুদে বৈজ্ঞানিক ॥ দিলীপ দাস 23 ঃ ব্ল্যাক ডায়মণ্ডস ॥ গৌতম কর্মকার 43

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ ঃ উত্তরদাতাদের নাম 59 ঃ অটোগ্রাফ সহ গ্রন্থ উপহার 60 ঃ সাউণ্ড সুইচিং সিস্টেম ॥ নির্মলেন্দুবিকাশ পাত্র 61 ক্যুইজ কনটেস্ট ॥ 56 ঃ শব্দকুট ॥ সুজন কুমার দাস 57 ॥ রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ॥ হিমাংশু পাল 41 ঃ অভিযান ॥ বিমান বসু 16 ঃ আতস জল ॥ অপরাজিত বসু 62 ঃ বলতে পারো কেন ॥ সুধাংশু পাত্র 65 ঃ বিজ্ঞানের খবর ॥ বরুণ মজুমদার 66 ঃ প্রতিযোগিতার সমাধান 57 ॥ আই কিউ টেস্ট 57

প্রচ্ছদ ঃ অলয় ঘোষাল ॥ অন্যান্য ছবি ঃ অলয় ঘোষাল, সুবোধ মণ্ডল

জুলাই সংখ্যার প্রচ্ছদশিল্পীর নাম অলয় ঘোষালের পরিবর্তে সমীর মণ্ডল পড়তে হবে।

চিঠিপত্র

বসুবিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল

এপ্রিল 87 সংখ্যায় প্রকাশিত "বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল" চিঠিটি পড়লাম। চিঠিটিতে প্রবন্ধ লেখক বিমান বসুর যে ভুলটি তুলে ধরা হয়েছে তা হয়ত মুদ্রণ প্রমাদের ফল। লেখক সম্ভবত তাঁর পাণ্ডুলিপিতে বাংলা সংখ্যায় লিখেছিলেন বিশ বছর পরে তাঁর স্বপ্ন সফল হয়। অক্ষরে লেখেননি। ছাপার সময় সংখ্যাকে রূপান্তরিত করতে গিয়ে প্রমাদটি ঘটে। যাই হোক বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বিশদভাবে পাঠকদের কাছে তুলে ধরছি।

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের 70তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রদর্শনীর একটি কক্ষ। ছবি: শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়

1897 সালে জগদীশচন্দ্রের মনে বিজ্ঞান মন্দির স্থাপনের প্রেরণা জাগে। জানা যায় পত্নী অবলা বসুর বর্ণনায়। বর্ণনাটি আজ বিজ্ঞান মন্দির পরিকল্পনার ঐতিহাসিক দলিল। তিনি লিখেছিলেন,...."এই রয়াল ইন্‌সটিটিউশনের কার্য পদ্ধতি দেখিয়া তখন হইতেই আমাদের দেশে এরূপ কোন স্থান করিবার বাসনা আমার মনেও উদয় হইল এবং বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সূচনা ও কল্পনা তখন হইতেই আরম্ভ হইল।"

বিদেশ সফর শেষে ফিরলেন জগদীশচন্দ্র। দেশে ফেরার কিছুকাল পরে একটি অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে গেল। তারিখটি 1897 সালের 27 শে ডিসেম্বর। কলকাতায় এসেছেন জগদীশচন্দ্রের প্রাক্তন অধ্যাপক বিলেতের রয়্যাল সোসাইটির অন্যতম সদস্য বৈজ্ঞানিক লর্ড র‍্যালে। ঐদিন তিনি হাজির হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। জগদীশচন্দ্রের গবেষণা খুঁটিয়ে দেখলেন। কাজের প্রশংসা করলেন। কিন্তু সেদিন বিকেলেই প্রেসিডেন্সি কলেজের তদানীন্তন অস্থায়ী প্রিন্সিপাল জগদীশচন্দ্রকে কৈফিয়ত চেয়ে চিঠি লিখলেন 1 learn from Lord Rayleigh that he visited the Presidency College this morning....I should be glad to hear by what authority you have received outsiders into the Laboratory...

প্রতিবাদ করলেন জগদীশচন্দ্র। এতে ফল হলো বিপরীত। গবেষণার কাজ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে এসেছিলেন। জানা যায় ত্রিপুরার মহিমচন্দ্র দেববর্মণের "দেশীয় রাজা গ্রন্থে" তিনি লিখেছিলেন, "একদিন রবিবাবুর তলবে জগদীশবাবুর গৃহে উপস্থিত হইয়া *জানিতে পারিলাম, প্রাইভেট কার্যে কলেজের বিজ্ঞানাগার ব্যবহার করা কর্তৃপক্ষের অভিপ্রেত নহে (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জগদীশচন্দ্রের গবেষণাকে কলেজ কর্তৃপক্ষ* ব্যক্তিগত কাজ হিসেবেই চিহ্নিত করেছিল)। রবিবাবু ইহাতে মর্মান্তিক বেদনা

ইলেকট্রনিক্স মডেল

এপ্রিল সংখ্যায় ইলেকট্রনিক্স মডেল বাড়ানো হোক বলে কয়েকজন যে অভিমত প্রকাশ করেছেন আমরা তার প্রতিবাদ করি। তাঁরা নিতান্তই অবিবেচকের মতো কথা বলেছেন। তাঁরা জানেন না পাঠকদের ক'জনের ইচ্ছা পূরণ করতে পারে এই মডেলগুলো। এই বিরাট অংশের পাঠকদের কথা তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন। তাছাড়া ওঁরা ইলেকট্রনিক্সের অন্ধ অনুসরণকারী ছাড়া কিছুই নন। কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান-এর প্রতি সংখ্যায় একঘেয়ে ভাবে যে মডেলগুলো প্রকাশিত হয়ে থাকে সেগুলোর প্রকৃতই কোন সার্থকতা নেই। কোনমতে সার্কিট অনুযায়ী কতকগুলো পার্ট'স কিনে যোগ করে দেওয়াটা আমাদের কাছে অন্ধ অনুকরণ ছাড়া আর কিছু নয়। এতে মৌলিক চিন্তাভাবনা করার প্রেরণা থাকে না। অনেক সহজ সাধারণ কিংবা চিন্তাকর্ষক অজানা বিষয়ও আছে, যা সামান্য ব্যাখ্যাতেই সহজ ও সরল হয়ে যেতে পারে। সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে অভিনব বা নতুন চিন্তাসমৃদ্ধ, আনন্দপ্রদ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি বা প্রোজেক্ট তৈরির কলাকৌশল প্রকাশিত হলে খুশী হতাম। সবদিক ভেবে এ ধরনের 2টি এবং 1টি ইলেকট্রনিক্স মডেল করা যেতে পারে। জনপ্রিয় এই পত্রিকার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে যদি আমাদের মতামতকে যথাযথ বিচার দেওয়া হয়। অন্যান্য যাঁরা আমাদের মতের সমর্থক তাঁরা নিশ্চয়ই তাঁদের মত প্রকাশ করবেন আশা করি। বহুদিন চেয়ে চেয়ে শেষ পর্যন্ত চিঠি দিলাম।

অনির্বাণ রায়, অনুপম দত্ত, গৌতম ঘোষ, চন্দন দে ও *অন্যান্যরা, বেলতলা।*

অনুভব করিলেন। বিশেষতঃ বুঝিলেন জগদীশবাবুর নিজের বিজ্ঞানাগার না হইলে তাঁহার বিজ্ঞানের নূতন তথ্য আবিষ্কারের পথ চিরতরে বন্ধ হইয়া যাইবে। পরামর্শ হইল 20,000 টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে। 10,000 টাকা রবিবাবু নিজের আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিবেন। বাকী টাকার জন্য ত্রিপুরার দরবারে ভিক্ষা করিতে উপস্থিত হইবেন।"

কিন্তু এত পরিকল্পনা সত্ত্বেও বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা তখনই বাস্তবে রূপায়ণ সম্ভব হলো না। কেটে গেল অনেকগুলো বছর। 1915 সালে 30 শে নভেম্বর তারিখে জগদীশচন্দ্র কলেজ থেকে অবসর নেন (পুরোপুরি ভাবে নয়)। এবার জগদীশচন্দ্র বসু আকাঙ্ক্ষিত বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার কাজে হাত দিলেন। সাধারণত দেখা যায় অতীত সংকল্প যখন বাস্তবের কাছাকাছি হয় তখন সংকল্পের সামর্থ্যে ঘাটতি পড়ে। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের কাছে তা হ'ল বিপরীত। তিনি সমস্ত জীবনের কষ্টার্জিত সঞ্চয়কে একত্রিত করে বিজ্ঞান মন্দির তৈরির কাজ শুরু করলেন। তিনি বললেন, "আমার স্ত্রী ও আমি এই গবেষণাগারের জন্য সর্বস্ব দান করছি।" প্রস্তুতি পর্বের শেষলগ্নে বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে আমেরিকা যেতে হয়। তিনি সেখান থেকে জগদীশচন্দ্রকে লিখলেন:···কিন্তু এত তোমার একলার সংকল্প নয়, এ আমাদের সমস্ত দেশের সংকল্প, তোমার জীবনের মধ্যে দিয়ে এর বিকাশ হতে চলল। জীবনের ভিতর দিয়েই জীবনের উদ্বোধন হয়—তোমার প্রাণের সামগ্রীকে তুমি আমাদের দেশের প্রাণের সামগ্রী করে দিয়ে যাবে—তারপর থেকে সেই চিরন্তন প্রাণের প্রবাহে আপনিই সে এগিয়ে চলতে থাকে।

1917 সাল। নিজের জন্মদিন 30 শে নভেম্বর তারিখে ঐতিহাসিক বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসব শুরু হল। অনুষ্ঠান শুরুতে বক্তৃতা মঞ্চের নিচে দাঁড়িয়ে সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হলো বসু বিজ্ঞান মন্দিরের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত সঙ্গীতটি।

—"মাতৃ মন্দির পুণ্য অঙ্গন
কর মহোজ্জ্বল আজহে।
শুভ শঙ্খ বাজহে বাজহে।"

দিবাকর সেন, জে. সি বোস ইউনিট, বসু বিজ্ঞান মন্দির
কলিকাতা—700009

মশা

গত ফেব্রুয়ারি, 87 সংখ্যায় দীলিপ দাসের বৈজ্ঞানিক কমিক 'খুদে বৈজ্ঞানিক' অন্তর্গত খুদে যে কিউলেক্স মশার খোঁজে বনে-জঙ্গলে ঘুরছিল তার ঘরেই প্রচুর দেখতে পাওয়া যায় এবং তারা ম্যালেরিয়ার বাহক নয়। এটি ফাইলেরিয়া অর্থাৎ গোদ নামক রোগের বাহক। এ্যানোফিলিস জাতের মশা ম্যালেরিয়া বাহক এবং ডেঙ্গু, ইয়লো ফিভার ইত্যাদির বাহক 'এডেস' নাম আর এক জাতের মশা।

প্রীতম বন্দোপাধ্যায়, দুর্গাপুর বর্ধমান

দীর্ঘতম বাঁধ

মার্চ '87 সংখ্যায় সিনিয়র কুইজ কনটেস্টের 3 নং প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে, মহানদীর উপর নির্মিত হীরাকুঁদ বাঁধ পৃথিবীর দীর্ঘতম বাঁধ। কিন্তু আমার মনে হয় এটি ভুল। আর্জেন্টিনা-প্যারাগুয়ের সীমান্তে পারানা নদীর উপর নির্মিত 'ইয়াসিরিটা-অ্যাপাইপ' হল পৃথিবীর দীর্ঘতম বাঁধ।

নিবেদন ইতি—

শুভংকর ঘোষ, নালকোলা, পশ্চিম-দিনাজপুর, 733201

পদার্থ বিজ্ঞানের এককাবলী

জুন '87-র কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানে "পদার্থ বিজ্ঞানের এককাবলী" (পৃষ্ঠা 15) রচনায় লেখক শ্রদ্ধেয় শ্রী রমানাথ চক্রবর্তী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই M.K.S. এককগুলির উল্লেখ করেননি। কিন্তু, এটা আমাদের মনে রাখা উচিত যে, M. K. S. একক পদ্ধতি তুচ্ছ নয়। কারণ এই পদ্ধতির উপর ভিত্তি করেই আন্তর্জাতিক পদ্ধতির (International system of Units এর বা I. U.) প্রচলন হয়েছে। আবার শ্রদ্ধেয় শ্রী চক্রবর্তী পাউণ্ড ও গ্রামের সম্পর্ক দেখাতে গিয়ে লিখেছেন 1 কিলোগ্রাম = 2·204 পাউণ্ড। কিন্তু, এই সম্পর্কে 1 কিলোগ্রাম = 1·205 পাউণ্ড ধরতে হবে। কারণ হিসাব করলে দেখা যাবে, 1 কিলোগ্রাম = 2·2046.... হচ্ছে। তাই আসল মানে 2·.05 পাউণ্ড ধরা উচিত। আবার আর এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, $ত্বরণ = \frac{বেগ}{সময়}$। কিন্তু, এটিকে $ত্বরণ = \frac{বেগের বৃদ্ধি}{সময়}$ লেখা উচিত। মন্দন হলে এটি $\frac{বেগের হ্রাস}{সময়}$ হতো। লেখক আরেক জায়গায় লিখেছেন 1 পাউণ্ডাল = 13825 ডাইন। কিন্তু সেক্ষেত্রে 1 পাউণ্ডাল = 13825·7 লেখা উচিত ছিল। আবার আপেক্ষিক তাপের সংজ্ঞায় লেখক শ্রী চক্রবর্তী 'বস্তু' কথাটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু, এক্ষেত্রে 'বস্তুর' বদলে 'পদার্থ' কথাটি উল্লেখ করতে হবে। তবে তাপগ্রাহিতা ও জলসম-এর ক্ষেত্রে 'বস্তু' উল্লেখ করাই উচিত।

অনিন্দ্য দে, কল্যাণী ইউনিভার্সিটি এক্সপেরিমেন্টাল হাই স্কুল, নবম শ্রেণী, কল্যাণী, নদীয়া

বাংলাদেশে গ্রাহক হবার ঠিকানা সম্পাদক : বিজ্ঞানবার্তা
পোঃ বক্স—553, চট্টগ্রাম
ফোন : 207987

পক্ষিবিজ্ঞানী

সালিম আলি

গত 20শে জুন '87 ভারতীয় পক্ষিতত্ত্বের প্রাণপুরুষ ডঃ সেলিম আলি তাঁর 91 বছর বয়েসে আমাদের চিরতরে ছেড়ে গেলেন। জন্ম 12 নভেম্বর 1896। বম্বের গিরগাঁও এলাকা খেত্তওয়াদিতে। তিনি দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের নানা জায়গায় পাখির উপর সার্ভে করেন। এই সব সার্ভে করার মাধ্যমে ভারতীয় পক্ষী সম্বন্ধে অনুশীলনের অর্থাৎ বার্ড ওয়াচিং-এর একটি রীতিমাফিক পদ্ধতির পাকাপোক্ত ভিত তিনি গেঁথে দিয়েছেন। তাঁর বহুকালের অভিজ্ঞতা, খুঁটিয়ে, খুব কাছ থেকে পরিদর্শন এবং অনুশীলনের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে তাঁর যুগান্তকারী কীর্তি, দশ খণ্ডে বিভক্ত অমর গ্রন্থ, 'এ হ্যাণ্ডবুক অব বার্ডস ইন ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড পাকিস্তান' (1968-74)। এই বিপুল গ্রন্থ সম্ভারের সহ-লেখক আছেন একজন। তিনি ডঃ মিডনে ডিলন রিপ্লে, ওয়াশিংটনের স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশনের সেক্রেটারি, যিনি 35 বছরের বেশি সময় ধরে ভারতীয় পক্ষিতত্ত্বের সঙ্গে একান্তভাবে সংশ্লিষ্ট।

1886 সাল থেকে বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি তার নিজস্ব পত্রিকা বার করে। সেই থেকে পক্ষিতত্ত্ব সম্বন্ধে পত্রিকা প্রকাশনার ধারাবাহিকতার ছেদ পড়ে নি। এশিয়ার প্রাকৃতিক ইতিহাসের শীর্ষস্থানীয় প্রকাশনা বলে পত্রিকাটি আন্তর্জাতিক সম্মান ও খ্যাতি অর্জন করেছে। ডঃ সালিম আলির লেখা নিয়মিত ও পত্রিকায় বার হয়েছে।

তিনি সম্মান ও পুরস্কার পেয়েছেন অনেক। দেশে এবং বিদেশেও। প্রথম সম্মান পান 1953 তে এসিয়াটিক জুলজিতে রিসার্চের জন্য এসিয়াটিক সোসাইটির জয় গোবিন্দ ল মেডেল। 1958-তে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পদ্মভূষণ উপাধি। 1971-এ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ডঃ অফ সায়েন্স। 1976-তে ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত পদ্মবিভূষণ।

তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য পুস্তক—দ্য বুক অফ ইণ্ডিয়ান বার্ডস (1941), দ্য বার্ডস অফ কাচ (1945), ইণ্ডিয়ান হিল বার্ডস (1949) দ্য বার্ডস অফ ট্রাভাঙ্কোর অ্যাণ্ড কোচিন (1953), দ্যঃ বার্ডস অফ সিকিম (1962), দ্য বার্ডস অফ কেরালা (1968), হ্যাণ্ডবুক অফ দি বার্ডস অফ ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড পাকিস্তান (1968-74), 13 খণ্ড ফিল্ড গাইড টু দি বার্ড'স অফ দি ইস্টার্ন হিমালয়নস (1977) দ্য ফল অফ এ স্পারো (1985)।

—অজয় হোম

ভিন গ্রহে প্রাণী

সমরজিৎ কর

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বছর চার পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি সংবাদ-পত্রে অদ্ভুত একটি খবর বেরিয়েছিল। খবরটি কলকাতার একটি বিখ্যাত ইংরেজি কাগজেও ছাপা হয়। খবরটি ছিল এই রকমঃ জনৈক মার্কিন বৈমানিক—বাড়ি তাঁর ইনডিয়ানাপোলিস-এ। গরমের ছুটি কাটাতে তিনি বাড়ি এসেছিলেন। তাঁর বাড়ির কিছু দূরে একটি অনুচ্চ পাহাড়। সামনে উপত্যকা। বিকেলের দিকে সেই উপত্যকায় বেড়াতে বেরিয়েছিলেন তিনি। বেড়ানোর পর যখন ঘরে ফিরছেন, তখন সূর্য সবে ডুবুডুবু। আকাশ পরিষ্কার। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল, দক্ষিণ পশ্চিম আকাশে উজ্জ্বল একটি আলো। তাঁর মনে হয়, হয়ত সেটি কোন একটি গ্রহ। অবাকই হলেন তিনি। বৈমানিকরা এমনিতেই গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে যথেষ্ট খবরাখবর রাখেন। কিন্তু এত উজ্জ্বল গ্রহ আগে কখনো তো তিনি দেখেন নি? বিমান চালনার জন্যে বৈমানিকদের আকাশে বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান সম্পর্কে জানতে হয়। তাই বলে এমন একটি উজ্জ্বল গ্রহ?

পরক্ষণেই অবাক কাণ্ড। ভদ্রলোক দেখলেন, উজ্জ্বল সেই আলো আকাশ পথে যেন দ্রুত এগিয়ে আসছে। প্রথমে মনে হল একটি বিমান। পাইলট বুঝি ভুল করে সার্চ লাইট জ্বেলে রেখেছে। কিন্তু কাছাকাছি হতেই দেখা গেল—যেন একটি পিরিচ। কোন শব্দ নেই। পিরিচটি ক্রমে আকাশ থেকে নেমে এল পাহাড়ের চূড়ায়। তার চারপাশে আলোর বলয়। ঘাবড়ে না গিয়ে ভদ্রলোক দৌড়তে শুরু করলেন পাহাড়ের ঢাল বেয়ে চূড়ার দিকে। তারপর কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন। বিস্ময়ে কাঁপছেন তিনি।

দেখলেন, পিরিচটির উপরে ঢাকনার মত অংশটি খুলে গেল। দেখা গেল একটি মূর্তি। সমস্ত শরীর, মানে মাথা থেকে পা পর্যন্ত, পোশাকে ঢাকা। মূর্তিটি পিরিচের ভেতর থেকে নেমে এসে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর ফিরে গেল পিরিচের মধ্যে। পরক্ষণে পিরিচের ঢাকনাটি বন্ধ হতেই পিরিচটি প্রচণ্ড গতিতে উঠে গেল ঊর্ধ্বাকাশে। অবশেষে সেকেণ্ডের মধ্যে অদৃশ্য।

খবরটি ছাপার পর বেশ হই-চই পড়েছিল কয়েক দিন। নানা রকম গল্পও প্রচারিত হয়। অনেকের ধারণা হয়, বৈমানিকটি সেদিন যাকে দেখেছিলেন, সে হয়ত সৌরজগতের বাইরের কোন গ্রহ থেকেই পৃথিবীতে আসে। অনেকে আবার ব্যাপারটা নেহাৎ-ই গালগল্প মনে করে উড়িয়ে দেয়।

গালগল্প বললেও ব্যাপারটা নিয়ে বেশ কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানী এখনো মাথা ঘামাচ্ছেন। কারণ একবার তো নয়, ওই ধরনের পিরিচের খবর মাঝে মাঝেই পাওয়া যায়। কেউ ভূ-পৃষ্ঠে দাঁড়িয়ে দেখেছে, আবার অনেক বিমান চালকের মুখেও শোনা যায় উড়ন্ত পিরিচের গল্প। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ওই সব পিরিচ আসলে এক একটি মহাকাশযান। ওই সব যানে চড়ে ভিন গ্রহের প্রাণীরা পৃথিবীর পরিমণ্ডলে এসে হাজির হয়। হয়ত তারা পৃথিবীরই মত মানুষ। অথবা মানুষের মতই কোন প্রাণী। তারা বাস করে সৌরজগৎ থেকে বহু দূরে, কোন ভিন্ন নক্ষত্র জগতে। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় গ্যালাক্সি। হয়ত সূর্যের মত সেখানেও রয়েছে কোন নক্ষত্র। সূর্যের গ্রহগুলির মত সেই নক্ষত্রগুলিকেও ঘিরে পরিভ্রমণ করে একাধিক গ্রহ। সেই সব গ্রহের মধ্যে পৃথিবীর মত গ্রহও রয়েছে। রয়েছে সাগর-মহাসাগর, নানা রকম উদ্ভিদ এবং প্রাণী। সেই প্রাণীদের মধ্যে উন্নত ধরনের প্রাণীও থাকা সম্ভব। যারা মানুষের চেয়েও বুদ্ধিমান। যাদের সভ্যতা মানুষের সভ্যতার চেয়েও উন্নত।

সত্যি কথা বলতে কি, ভিন গ্রহে প্রাণী আছে কি নেই এ নিয়ে বহুদিন ধরে কত রকম জল্পনাই না চলছে। দূরবীনে যখন মঙ্গল গ্রহের ছবিটি স্পষ্ট হয়ে উঠল, সেখানে দেখা গেল পাহাড়, বরফ, খালের মত ভূভাগ, তখন অনেকেই ধরে নিয়েছিল, পৃথিবীর মত মঙ্গল গ্রহেও বাস করে প্রাণী এবং উদ্ভিদ। হয়ত সেখানে রয়েছে মানুষের চেয়েও উন্নত প্রাণী। তারাই মঙ্গলের বুকে কেটেছে দীর্ঘ খাল—চাষবাসের জন্যে। 1960-এর দশকে কোন কোন সোভিয়েত বিজ্ঞানী এমন কথাও বলেন, তাঁদের বিশ্বাস মঙ্গলের বহু অঞ্চল অরণ্য অধ্যুষিত। সেখানকার গাছগুলির পাতা আকারে বড় এবং পুরু। বিশেষ পদ্ধতিতে সালোকসংশ্লেষণ চালিয়ে তারা শর্করা খাদ্য তৈরি করে।

মানুষের যাবতীয় কল্পনার মুখে ছাই ফেলেছে আধুনিক মহাকাশ গবেষণা। এক সময় বলা হত শুক্র এবং মঙ্গল গ্রহে প্রাণী থাকা সম্ভব। কিন্তু গত কুড়ি বছরে মহাকাশযান পাঠিয়ে এই দুটি গ্রহে অনুসন্ধান চালান হয়েছে বিস্তর। শুক্রে কোন প্রাণের সন্ধান পাওয়া যায় নি। আশা ছিল মঙ্গলে হয়ত পাওয়া যেতে পারে। সে গুড়েও বালি পড়েছে

মার্কিন মহাকাশ যান ভাইকিং থেকে মঙ্গলের বুকে নামান হয়েছিল যান্ত্রিক গবেষণাগার। সেই গবেষণাগারে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে মঙ্গলের মাটি নিয়ে পরীক্ষাও চালান হয়েছিল। মঙ্গলের ভূপৃষ্ঠে দাঁড়িয়ে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র দূরবীনের সাহায্যে সেখানকার ভূপ্রকৃতির ছবিও তোলে। সেই ছবিতে বড় বড় গাছপালা তো দূরের কথা এক টুকরো ঘাসও ধরা পড়ে নি। বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন, গাছপালা বা বড়সড় প্রাণী না থাকলেও মঙ্গলের মাটিতে নিদেন পক্ষে হয়ত ব্যাকটেরিয়া পাওয়া যাবে। তাও পাওয়া যায় নি। সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহ সম্পর্কেও এ পর্যন্ত যতটা জানা গেছে তাতে অনেকেই মনে করেন সে সব গ্রহেও প্রাণী নেই।

হয়ত নেই। কিন্তু আমাদের গ্যালাক্সিতে তো কোটি কোটি নক্ষত্র রয়েছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে রয়েছে কোটি কোটি গ্যালাক্সি। এক একটি গ্যালাক্সিতে রয়েছে কোটি কোটি নক্ষত্র। এমন অসংখ্য নক্ষত্রের মধ্যে সূর্যের মত আর একটিও নক্ষত্র থাকবে না, এটাই বা কি করে বিশ্বাস করা যায়? বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে নিশ্চয় এমন অনেক নক্ষত্র রয়েছে যারা সূর্যেরই মত। তাদেরও চারপাশে পরিক্রমণ করে একাধিক গ্রহ। সেই সব গ্রহের কোন কোনটিতে হয়ত বিরাজ করছে পৃথিবীর মতই প্রাণিজগৎ।

1960-এর দশকের কথা। কেমব্রিজের মুলার্ড মানমন্দির থেকে পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছিলেন বিজ্ঞানীরা রেডিও নক্ষত্রের উপর। নাটকীয়ভাবে তাঁরা অদ্ভুত একটি উৎসের সন্ধানও পেলেন। সেখান থেকে আসছিল বেতার সংকেত। নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর আসছিল সংকেত—একেবারে যেন ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী। বিজ্ঞানীদের মনে হয়, অজ্ঞাত কোন নক্ষত্রের প্রাণীরা ওই সংকেতের সাহায্যে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। কারণ ওই সংকেতের চরিত্র ছিল বেতার টেলিগ্রাফের সংকেতের মত।

শুরু হল হই চই। খবরের কাগজে লেখা শুরু হল নানা জনের লেখা। সবার মুখে এক কথা: বিজ্ঞানীরা সুদূর নক্ষত্র জগতের প্রাণীর কাছ থেকে বেতার সংকেত পাচ্ছে। যাঁরা ভিনগ্রহে প্রাণীর কথা ভাবছিলেন, তাঁদের উৎসাহের অন্ত নেই।

কিছুদিন যেতেই ভুল ভাঙ্গল। দেখা গেল অমন উৎস অনেক আছে। আসলে তারা বিশেষ এক ধরনের নক্ষত্র। সম্ভবত শুধু নিউট্রন কণা দিয়ে তৈরি। তাদের পরিমণ্ডল থেকেই আসছে সংকেতের মত রেডিও তরঙ্গ। এ ধরনের নক্ষত্রকে বলা হয় নিউট্রন নক্ষত্র। নির্দিষ্ট সময় অন্তর (কখনো কয়েক সেকেণ্ড বা এক সেণ্ডের চেয়েও অনেক কম সময় অন্তর) ওই সব নক্ষত্র থেকে এক একটি বেতার সংকেত আসে বলে, বিজ্ঞানীরা ওই ধরনের নক্ষত্রের নাম রেখেছেন 'পালসার'। পালসার নক্ষত্রে প্রাণের কোন অস্তিত্বই থাকা সম্ভব নয়।

তা না থাকুক। তবু কেউ কিন্তু এখনো পর্যন্ত আশা ছাড়েন নি। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিশ্চয় অনেক নক্ষত্র রয়েছে, যেখানে প্রাণীরা বাস করে। আমরা জানি, জীবদেহ আসলে নানা রকম রাসায়নিক যৌগ দিয়ে তৈরি। এই সব যৌগের মধ্যে থাকে নানা রকম মৌলিক পদার্থ। তবে সব চেয়ে যে তিনটি মৌলিক পদার্থ বেশি পরিমাণে থাকে তারা হল কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন। এ ব্যাপারটা ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে যাবতীয় প্রাণী এবং উদ্ভিদের মধ্যেই দেখা যায়। এই তিনটি মৌলিক পদার্থের মধ্যে কার্বনের ভূমিকাই প্রধান, তাও দেখা গেছে। কেউ কেউ ভাবছেন, ভিন গ্রহের প্রাণীর দেহে কার্বন নাও তো থাকতে পারে? কার্বনের পরিবর্তে তাদের দেহ তৈরির ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা নেয় 'সিলিকন'। সিলিকনের সঙ্গে কার্বনের অনেক মিল। বিশেষ করে রাসায়নিক যৌগ তৈরির ব্যাপারে। অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে কার্বন যেমন তৈরি করে কার্বন ডাই-অক্সাইড, সিলিকন তেমনি অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে তৈরি করে সিলিকন ডাই-অক্সাইড। কার্বন হাইড্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেমন তৈরি নানা রকম হাইড্রোকার্বন (জৈব যৌগ)। সিলিকনও তেমনি করতে পারে। কার্বন-ঘটিত বিভিন্ন জৈব যৌগ যেমন পলিমার তৈরি করে (একই রাসায়নিক যৌগের একাধিক অণু মিলিত হয়ে যে বৃহৎ অণু সৃষ্টি করে, তাকে বলা হয় পলিমার), কার্বনঘটিত সিলিকন যৌগও তা করতে পারে। অতএব ভিন গ্রহের প্রাণী সৃষ্টিতে কার্বনের পরিবর্তে সিলিকনই কাজ করে। সেখানকার পরিবেশের জন্যেই হয়ত তা দরকার।

সত্যি কথা বলতে কি, ভিন গ্রহের প্রাণী নিয়ে জল্পনার যেন শেষ নেই। মার্কিন দেশ তো একটি মহাকাশযানই পাঠিয়েছে। এই মহাকাশযান থেকে ভিন গ্রহে প্রাণীর সন্ধান চালানর চেষ্টা চলছে। আশা করা যায়, আগামী শতাব্দীর গোড়ায় এ ব্যাপারে অনেক নতুন কথাও জানতে পারবে তোমরা।

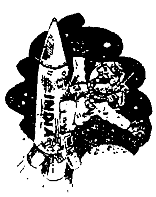

ভিন গ্রহে বুদ্ধিমান প্রাণী কি আছে

অদ্রীশ বর্ধন

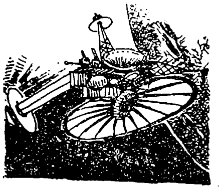

বৈজ্ঞানিক মহল প্যাঁচামুখ করে থাকেন প্রশ্নটা শুনলেই। অনেক ধানাই পানাই তো হয়ে গেছে এই ব্যাপারটা নিয়ে। বস্তাবস্তা কমিকস আর কল্পবিজ্ঞান লেখা আর ছাপা হয়ে গেছে, কাঁড়ি কাঁড়ি রোমাঞ্চকর সিনেমাও হয়ে গেছে, পালে পালে ভিনগ্রহীরা নাকি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ন চাকী চেপে পৃথিবীময় টহল দিয়ে যাচ্ছে—পৃথিবীর মানুষদের যন্ত্রযানে চাপিয়ে ঘুরিয়েও আনছে (স্বচক্ষে যারা দেখেছে এবং যারা যন্ত্রযানে সত্যিই চেপেছে—তাদের লোমহর্ষক বিবরণ অনুসারে!)—তবুও একরোখা বৈজ্ঞানিকদের কিছুতেই পুরোপুরি বুঝিয়ে ওঠা গেল না যে—আছে, আছে, তারা আছে....বিশাল এই বিশ্বে ধীমান জীব আছে বইকি!

ডক্টর কার্ল স্যাগান ভদ্রলোক কিন্তু বিজ্ঞানী হয়েও বিষয়টা নিয়ে রীতিমত ভেবেছেন, বই-টইও লিখেছেন। আমেরিকার কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাস্ট্রনমি আর স্পেশ সায়েন্সের প্রফেসার ইনি। একেবারে বাজে কথা বলার অথবা বাজে কাজ করার লোক নন। ইনি কেন 'পায়োনীয়ার টেন' মহাকাশ পোতে সোনালী অ্যানোডাইজ্‌ড্ অ্যালুমুনিয়াম পাতে মানব-মানবী আর সৌরজগতের সাংকেতিক রেখাচিত্র এঁকে পাঠিয়ে দিলেন দূর, মহাশূন্যে? মানুষের হাতে তৈরি 'পায়োনীয়ার টেন'-ই প্রথম মহাকাশযান যা সৌরজগতের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে উড়ে গেল বহির্বিশ্বে—উড়ে যাবে 20 লক্ষ বছর ধরে, তারপর আসবে Aldebaram নক্ষত্রের কাছাকাছি, দশ বিলিয়ন বছর পরে ঢুকে পড়বে আর একটা নক্ষত্রের গ্রহমণ্ডলীর মধ্যে!

তারপর হয়ত গ্রহে গ্রহে রটে যাবে বার্তা—আছে, আছে, অমুক সৌরজগতের তিন নম্বর গ্রহে বিদঘুটে চেহারার প্রাণীরা থাকে। দেখছো না তাদের 'বিকট' রেখাচিত্র আঁকা রয়েছে ধাতুর পাতে ?

কিন্তু সেতো অনেক....অনেক বছর পরের কথা। তদ্দিনে পৃথিবীতে প্রাণ বলে কি কিছু থাকবে? খবর পেয়ে নাচতে নাচতে যারা ছুটে আসবে অদ্ভুত অদ্ভুত যন্ত্রযানে চেপে—তারা কি আদৌ পৃথিবীর অস্তিত্ব দেখতে পাবে ?

পাক আর না পাক, ডক্টর কার্ল স্যাগানের মত একজন খাঁটি বুদ্ধিজীবী মানুষ অন্যান্য উন্নাসিক এবং ভয়ঙ্কর রকমের অবিশ্বাসী সতীর্থদের কটাক্ষকে উপেক্ষা করেই জানিয়ে দিয়েছেন—হ্যাঁ, তাঁর মনে হয়, অন্য গ্রহে ধীমান প্রাণী থাকলেও থাকতে পারে!

মোদ্দা কথা হল এইটাই। প্রমাণ পাওয়া যাক আর না যাক, সন্দেহটা কিন্তু তাবড় তাবড় বৈজ্ঞানিক মনের কোণে উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করে দিয়েছে। ভীষণ বুদ্ধিমান সেই জীবরা পৃথিবীতে আনাগোনা শুরু করে দিয়েছে কিনা, সে বিষয়ে অবশ্য একবাক্যে সবাই অবিশ্বাসই প্রকাশ করে চলেছেন। কিছু জ্যোতির্বিজ্ঞানী তো সাফ বলে দিয়েছেন—ভিনগ্রহীদের এইভাবে পৃথিবীতে বেড়াতে আসাটা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার—যদিও তাঁরা বলছেন, উন্নত সভ্যতা থাকলেও থাকতে পারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বহু বিলিয়ন গ্যালাক্সির মধ্যে!

* * * *

অর্থাৎ, ঘুরে ফিরে আসছে সেই—রোমাঞ্চকর সন্দেহটা! আছে, আছে, হয়তো তারা আছে ঐ তারার মালাদের দেশে! বড্ড দূর বলে ঝট করে আসতে পারছে না!

তারার জগৎ তো কম নেই। ভাবলেও মুণ্ডু ঘুরে যায়। আমাদের এই গ্যালাক্সি মানে ছায়াপথেই রয়েছে বোধহয় 200 বিলিয়ন নক্ষত্র। এদের পরিবারে গ্রহ রয়েছে অসংখ্য, তাদের কোনটাতেই কি বুদ্ধিমান জীব নেই? থাকলেও থাকতে পারে, নয় কি। এমনও তো হতে পারে বুদ্ধিমান এই প্রাণীদের কেউ কেউ এমন সুসভ্য হয়ে উঠেছে যে টেকনোলজিতে আমাদের টেক্কা মেরেছে বহুকাল আগেই ?

বিচিত্র এই সম্ভাবনা সম্বন্ধে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডক্টর কার্ল স্যাগান কী বলেন? তাঁর একটা বই আছে। বইটার নাম The Cosmic Connection : An Experimental Perspective। এই কেতাবে তিনি একটা 'আশার হিসেব' কষে দেখিয়েছেন, নেই-নেই করেও আমাদের এই প্রাণপ্রিয় ছায়াপথেই প্রায় দশলক্ষ এহেন সুউন্নত সভ্যতা থাকলেও থাকতে পারে!

এরা কি পৃথিবীটাকে দেখতে মাঝে সাঝে আসে না? এসেছে যে তার অকাট্য প্রমাণ নেই। খুব ভাল কথা। না-আসারও তো কোন অকাট্য প্রমাণ নেই। তবে কেন

কট্টর বৈজ্ঞানিকরা মানতেই চান না যে বুদ্ধিমান জীবরা মাঝে মধ্যেই হানা দিয়ে চলেছে সবুজগ্রহ এই পৃথিবীতে? স্রেফ সময় লাগে বলে। এই তো মাত্র বছর তিরিশেক হল আমরা বেতার সংকেত পাঠিয়ে জানিয়েছি আমাদের অস্তিত্ব। সে খবর তারা পাবে, পালটা সংকেত পাঠাবে, আলোর গতিবেগে যাত্রা করলেও কয়েক হাজার বছর কেটে যাবে পৃথিবীতে পৌঁছাতে!

কিন্তু যেদিন তারা এসে পৌঁছোবে, সেদিন তাদের চেহারা দেখে নাকি ভড়কে যাবে দুরন্ত কল্পবিজ্ঞান লেখকরাও! অ্যাটম আর মলিকিউল দিয়েই গড়া থাকবে তাদের শরীর নিঃসন্দেহে—কিন্তু আকৃতি হবে এমনই অদ্ভুত যা কল্পনাকে হার মানিয়ে ছাড়বে।

তবে হ্যাঁ, উড়ন চাকী নিয়ে যারা মাতামাতি করেন, তাঁরা এতটা নাচানাচি না করলেই বোধহয় ভাল হয়। প্রযুক্তিবিদ্যায় যতই এগিয়ে থাকুক না কেন ভিনগ্রহীরা—অতদূর থেকে পৃথিবীতে বেড়াতে আসার আর ম্যাজিক দেখানো—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য খুব একটা নেই। এই কথাটা যেন উড়ন চাকী পাগলরা মনে রাখেন।

বিজ্ঞান সংবাদ

বিশ্ব পরিবেশ দিবস

'মুর্শিদাবাদ জেলা বিজ্ঞান পরিষদ'-এর উদ্যোগে এবং "পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ"-এর সহায়তায় গত 5-ই জুন 1987 স্থানীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাপীঠে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে একটি বিজ্ঞান আলোচনা সভায় বিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকগণ এবং পরিষদের সভ্যসভ্যারা বিভিন্ন ভাবে অংশ গ্রহণ করেন এবং পরিবেশ উন্নয়নে এ ধরনের অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে অনুভব করেন। সভাপতির কার্য পরিচালনা করেন ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক 'শ্রী অপর্ণা কিঙ্কর ভট্টাচার্য'। 'আর্সেনিক—মুর্শিদাবাদ জেলায় একটি সমস্যা'- এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে সুন্দর ও সহজভাবে মূল আলোচনা করেন এই পরিষদের সভ্য বিজ্ঞানী 'ডঃ পরিতোষ ভট্টাচার্য্য' তিনি বলেন, আর্সেনিকের ভয়াবহতা নিয়ে গুজব না রটিয়ে এবং সাধারণ মানুষের মনে অহেতুক আতঙ্ক না জাগিয়ে এই সমস্যা সম্বন্ধে সঠিক ভাবে গবেষণা ও পর্যালোচনা করার ব্যবস্থা করা দরকার।

সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল এর উদ্যোগে বিশ্ব-পরিবেশ দিবস

দ্যা সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের পক্ষ থেকে কোলকাতায় 5ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। এটি উদ্বোধন করেন কাউনসিল অফ্ সায়েন্স মিউজিয়ামের অধিকর্তা ডঃ সরোজ ঘোষ। শ্রী ঘোষ তাঁর ভাষণে বলেন পরিবেশ দূষণকারী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে যদি ন্যায়সংগত মনোভাব না গড়ে তোলা যায়, তাহলে কোনদিন দূষণ বন্ধ হবে না।

অনুষ্ঠানে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ভবানী মুখার্জি বলেন, বহু জিনিস আমরা নষ্ট করে ফেলে দিয়ে পরিবেশ দূষণ করি, অথচ সেগুলোকে পুনঃ প্রয়োগ করলে আর দূষণ হবে না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য ডঃ দিলীপ সিংহ প্রধান অতিথি ছিলেন। স্বাগতভাষণ দেন ডঃ এস. সি. পাকড়াশী। সেমিনার, প্রদর্শনী ও বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বহু ছাত্র-ছাত্রী অংশ নেন।

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ৭০তম জন্মজয়ন্তী

বসুবিজ্ঞান মন্দিরের 70তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ এক আকর্ষণীয় প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। প্রদর্শনীতে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু উদ্ভাবিত অনেকগুলি যন্ত্রের মধ্যে তাঁর মাইক্রোওয়েভ যন্ত্রও প্রদর্শিত হয়। এ ছাড়া আচার্যের হাতে লেখা বহু পাণ্ডুলিপি, দুষ্প্রাপ্য ছবিও প্রদর্শিত হয়। হরপ্পা ভ্রমণকালে আচার্য জগদীশ চন্দ্র কিছু মাটির শিল্পকর্ম সংগ্রহ করেছিলেন। সেইসব নিদর্শন ও আচার্যের ব্যক্তিগত জিনিসপত্রও প্রদর্শনীর মর্যাদা বৃদ্ধি করে।

পোস্টারের সাহায্যে প্রাণী ও উদ্ভিদ পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার বিষয়বস্তুও প্রদর্শনীর অন্যতম বিষয় ছিল।

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের মূল বক্তৃতা কক্ষটি বর্তমান গবেষণার বিভিন্ন প্রদর্শ বস্তু দিয়ে সাজানো হয়েছিল।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের মৃত্যুবার্ষিকী

গত ৪ই এপ্রিল 1987 তারিখে মুর্শিদাবাদ জিলা বিজ্ঞান পরিষদ-এর উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় পরিষদ ভবনে প্রখ্যাত প্রকৃতি বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের ষষ্ঠ মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি স্মরণ-সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক দিলীপ কুমার কর মহাশয়। গোপালচন্দ্রের মৌলিক গবেষণা ও তাঁর বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের বিস্তারিত আলোচনা করেন "বহরমপুর ডাল ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র"-এর প্রখ্যাত কৃষি-বিজ্ঞানী ডঃ পরিতোষ ভট্টাচার্য। সভায় স্বাগত ভাষণ দেন পরিষদ-এর সম্পাদক অধ্যাপক ডঃ মিহির কুমার দত্ত।

প্রাণী বিচিত্রা

শৈল চক্রবর্তী

পাখিদের ত মাথার দুপাশে চোখ থাকে। কিন্তু পেঁচার চোখ মানুষের মতো সামনে। তার চোখ দুটো যেমন বড় তেমনি তার দৃষ্টিও অতি তীক্ষ্ন।

অন্ধকারে অনেক দূর থেকে সে তার শিকার দেখতে পায় নির্ভুল ভাবে। তারপর বিদ্যুৎ বেগে ছুটে আসে নিঃশব্দে। শিকার খরগোশ ইঁদুর কিম্বা কোন ছোট চতুষ্পদ হতে পারে। শিকারী বন বিড়ালকেও সে তার ধারালো নখর দিয়ে ধরে শূন্যে তুলে নিয়ে যেতে পারে।

অবশ্য যাকে ধরতে যায় সে প্রায়ই চোখের নিমেষে লুকিয়ে পড়ে।

KJB/AUG/87/3

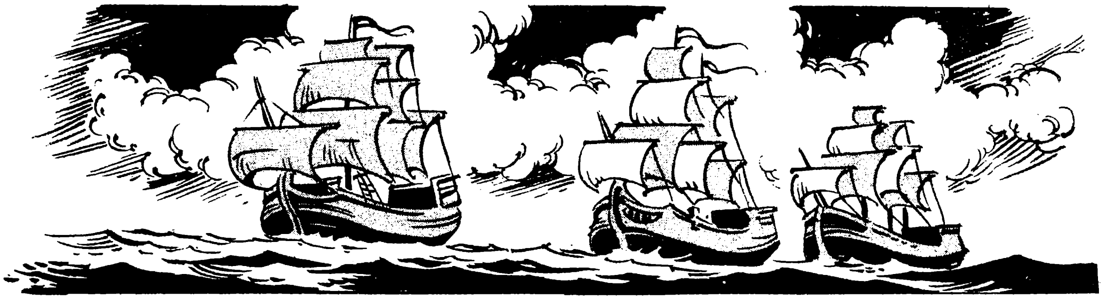

জন্মভূমি জেনোয়াতে আবার ফিরে গেলেন কলম্বাস। জেনোয়ার বন্দরে কতো জাহাজ। তাদের কেউ চলে যায় দক্ষিণ-পূর্বে, কেউ দক্ষিণ-পশ্চিমে। এমনি কোনও এক জাহাজেই তিনি যাত্রা করবেন পোর্তুগাল। পরিচিত পৃথিবীর সর্ব পশ্চিম সীমারেখা। লিসবন বন্দরে দেশ-বিদেশ থেকে কতো নাবিক দিনে দিনে জড়ো হয়। আবিষ্কারের উন্মাদনা নিয়ে ছুটে আসে কতো অভিযাত্রী। চারুশিল্প আর বিজ্ঞানচর্চার অন্যতম পীঠস্থান লিসবন। বিশ্বগঠনতত্ত্ব এবং জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষার এমন সুযোগ ইউরোপের আর কোনও দেশে নেই। সবার চেয়ে বড় কথা—সেখানে নৌচালনবিদ্যা শিক্ষণের এক বিরাট প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছেন প্রিন্স হেনরী। তাঁরই চেষ্টা আর প্রেরণার ফলে কতো নাবিক সমুদ্রে অভিযান চালিয়ে আবিষ্কার করেছেন কতো দ্বীপ। প্রিন্স হেনরী যদি তাঁকে সাহায্য করেন, তবে অস্তগামী সূর্যের দিকে অভিযান করে তিনি আবিষ্কার করবেন সেই নতুন জলপথ, যা এশিয়া মহাদেশকে আজকের ইউরোপের খুব কাছাকাছি এনে পৌঁছে দেবে।

দিনের পর দিন যায়। গ্রীষ্মের শুরুতে এক জলযাত্রার সুযোগ এসে গেল হঠাৎই। চার-চারটি জাহাজ যাবে পোর্তুগাল পার হয়ে ইংলণ্ডের পথে। সেই ইংল্যাণ্ড, যেখানকার মানুষ সমুদ্রকে জয় করেছে। হয়তো পোর্তুগালের চেয়ে আরও সাহসী, আরও অভিজ্ঞ নাবিকের যোগাযোগ সেখানে হয়ে যাবে। কে জানে, রাজা সপ্তম হেনরী তাঁর পরিকল্পিত অভিযানের পৃষ্ঠপোষকতাও তো করতে পারেন।

অতএব যাত্রা করলেন কলম্বাস। স্পেনের পূর্ব উপকূল পার হয়ে তাঁদের নৌবহর একদিন জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করলো। এবার উত্তরমুখে পোর্তুগালের উপকূল ছুঁয়ে আরও উত্তরে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের যাত্রাপথ।

চার-চারটি বাণিজ্য-জাহাজ সার বেঁধে চলেছে। মূল্যবান পণ্যগুলি তারা পৌঁছে দেবে ইংলণ্ডের বাজারে। ফিরে আসবে কতো নতুন নতুন পণ্যসম্ভারে জাহাজ ভরে নিয়ে। কিন্তু সে সুযোগ আর এলো না। বহর যখন সেণ্ট ভিনসেণ্ট অন্তরীপ অতিক্রম করছে, তখন একদিন দিকচক্রবালে দেখা

গেল জলদস্যুদের পতাকা। অসহায় বাণিজ্য-জাহাজগুলিকে তারা ঘিরে ফেললো উপকূলের দিক থেকে। অতএব যুদ্ধ, আত্মরক্ষা এবং সম্পদরক্ষার সংগ্রাম।

যে কলম্বাস আজীবন স্বপ্ন দেখে এসেছেন—তিনি হবেন এক বিরাট নৌঅভিযানের কর্ণধার, দিনে দিনে নিজেকে গড়ে তুলেছেন সেই মহানায়কত্বের যোগ্য করে, সেই কলম্বাস কিন্তু ভীত আদৌ হলেন না। সহযাত্রী নাবিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করে তিনি বাধা দিলেন অত্যাচারী দস্যুদের। মনোরম মানচিত্র এঁকে যিনি জীবিকা নির্বাহ করেছেন কতো দিন, যাঁর হস্তলিপি পাঠককে বিমুগ্ধ করেছে বারবার, সেই শিল্প-মণ্ডিত হাত এবার অসিচালনায় সকলকে স্তম্ভিত করে দিল। গায়ে তাঁর সামান্য আঁচড়টিও লাগলো না। যুদ্ধ থামলো,

কিন্তু শেষরক্ষা করা গেল না। জলদস্যুদের দল আগুন ধরিয়ে দিল দুটো জাহাজে। আতঙ্কিত নাবিকদের আর্তনাদে বাতাস ভারী হয়ে উঠলো। আগুনের ধোঁয়ায় শ্বাস নেওয়া ক্রমেই কষ্টকর হয়ে এলো। জাহাজ একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছে। দিকচিহ্নহীন সমুদ্রে নেমে আসছে অন্ধকার। তবে কি এই শেষ? অস্তগামী সূর্যের পথ ধরে তাঁর দুস্তর অভিযানের যে সঙ্কল্প, এইখানেই কি তার সমাপ্তি?

দুর্জয় কলম্বাস একটা দাঁড় মাত্র সম্বল করে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পঁচিশ বছরের তরুণ যুবক তাঁর চোখের সামনে দেখলেন—একটু একটু করে ডুবে গেল আক্রান্ত জাহাজ দুটি। তারপর অন্ধকার, আর সাগরজলের ছলছলানি। স্রোতের অনুকূলে গা ভাসিয়ে কলম্বাস সাঁতার কেটে কেটে এগুলেন। কে জানে, তীরে আর কখনো পৌঁছতে তিনি পারবেন, নাকি শেষ হয়ে যাবেন সমুদ্রেই।

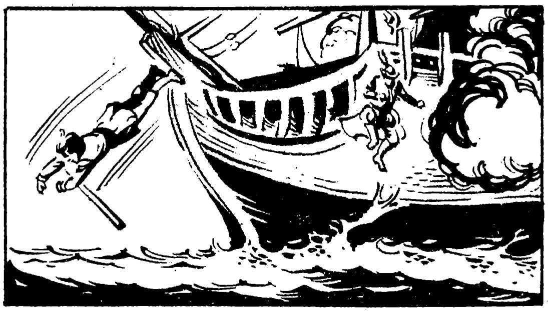

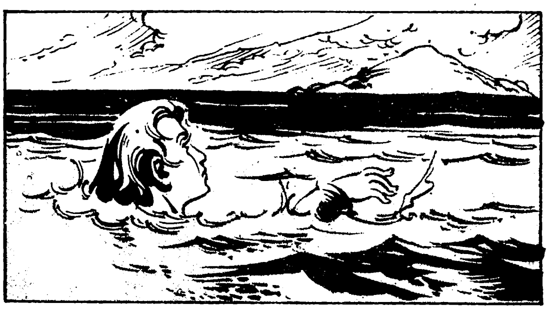

দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করেই মানুষকে জিততে হয়। তবু সঙ্গী যদি থাকে, তবে একাকীত্বের যন্ত্রণা খানিক কমে। সেই আশা নিয়েই কলম্বাস চিৎকার করে বারবার ডাকলেন। কিন্তু সাড়া কেউ দিল না। তবে কি কেউ বেঁচে নেই? আকাশের দিকে চোখ রেখে কলম্বাস তটভূমির দিক স্থির করে প্রাণপণে সাঁতার কাটতে লাগলেন। তিনি কি পারবেন?

শেষ রাতে একটা পাহাড়ের অস্পষ্ট ছায়া যেন চোখের সামনে ভেসে উঠলো। হ্যাঁ, ঐ তো স্যাগ্রিজ পাহাড়! ওর কাছেই তো প্রিন্স হেনরী তাঁর নৌচালনবিদ্যা শিক্ষণের কেন্দ্র রচনা করে নাবিকদের ডাকছেন। এতো যন্ত্রণার মধ্যেও একটা আশ্চর্য অনুভব এলো কলম্বাসের মনে—তিনি ঈশ্বর কর্তৃক নির্বাচিত। তাই ভাগ্য তাঁকে নিয়ে চলেছে সেই জগতে যার জন্যে এতোদিন উন্মুখ হয়ে তিনি অপেক্ষা করে ছিলেন।

রাত যখন ভোর হোল, দিনের আলোয় তীরের কিছু মানুষ যখন অর্ধমৃত অবস্থায় কলম্বাসকে তটভূমি থেকে উদ্ধার করলেন, তখনও মনে মনে ইতিহাসের দিনলিপি রচনা করে চলেছেন কলম্বাস—13 আগস্ট, 1476।

জাহাজডুবির খবর মানুষের মুখে মুখে চারপাশে ছড়িয়ে গেল। লিসবনেরই এক প্রান্তে আপন কুটীরে তখন তন্ময় হয়ে মানচিত্র এঁকে চলেছে আর এক তরুণ। জাহাজগুলি জেনোয়ার—এই খবর সে যখন পেলো, তখন কাজে আর মন বসলো না। আজ কতো দিন সে দেশছাড়া। সেই জেনোয়ারই এক মানুষ সাগরে ভাসতে ভাসতে লিসবনের তটভূমিতে এসে পৌঁছেছেন। বিচলিত তরুণটি ছুটে গেল দেখা করতে। দুই ভাইয়ের মিলন হোল কতোদিন পর!

দা—দা!

বার্থলোমিউ! তুই! এখানে?

[চলবে]

ড্যামসেল ফ্লাই

ড্যামসেল ফ্লাই (Damselfly) একজাতীয় পতঙ্গ। নাম থেকেই এদের সুসজ্জিত ও সম্ভ্রান্ত মহিলার চেহারার আভাস মেলে। ড্রাগনফ্লাই বা ডাঁশমশার নিকট আত্মীয় এরা, তবে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতির ও রুগ্নপ্রকৃতির। সবচেয়ে বড় আকারের ড্যামসেল ফ্লাইয়ের দৈর্ঘ্য প্রায় 5 ইঞ্চি। উড্ডয়নে এরা তত পটু নয়। এরা যখন কোন স্থানে বসে থাকে তখন প্রজাপতির মতোই এদের ডানা পিঠের ওপর খাড়া করা থাকে। প্রজাতি ভেদে ডানার রঙ ভিন্ন হতে পারে আবার অনেক প্রজাতিতে পুরুষের ডানা হয় বিচিত্র রঙের কিন্তু স্ত্রী পতঙ্গের ডানা স্বচ্ছ ও বর্ণহীন। পুরুষের ডানার এই সৌন্দর্য বোধ করি স্ত্রীপতঙ্গদের আকৃষ্ট করবার জন্যই। এদের ডানার রঙ নীল, লাল বা কিছুটা সবুজ হতে পারে।

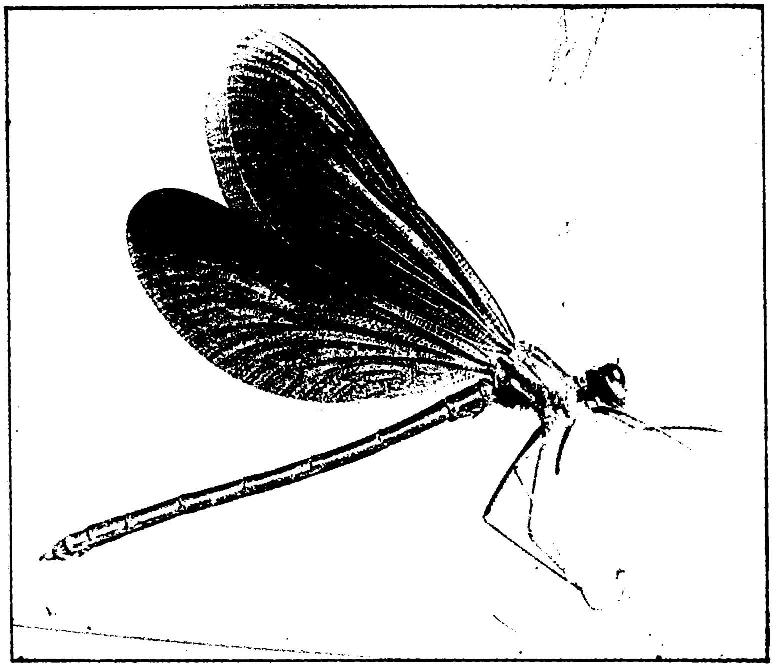

পরিণত ড্যামসেলের খাদ্য প্রধানতঃ ক্ষুদ্র আকারের বিভিন্ন পতঙ্গ। বিশ্রামের সময়ে বা উড়ন্ত অবস্থাতে এরা খাদ্য শিকার করে থাকে। এদের লার্ভারা যেহেতু জলে বড় হয় তাই তাদের খাদ্য বিভিন্ন ক্ষুদ্রাকৃতির জলজকীট। এদের দেহের গঠন উন্নতমানের নয়, তাই এরা খুব একটা শক্ত সমর্থ ও ক্ষিপ্রগতি সম্পন্ন হয় না, তবে তীক্ষ্ন দৃষ্টি এদের শিকার সন্ধানে যথেষ্ট সাহায্য করে।

এদের জীবন-চক্র সম্পন্ন করতে জল ও স্থল উভয় স্থানেরই প্রয়োজন, কারণ পরিণত অবস্থায় এরা স্থলে থাকলেও এদের লার্ভা দশা সম্পন্ন হয় জলে, তাই পুকুর, খাল, ডোবা বা ঐ জাতীয় কোন জলাশয়ের কাছাকাছি এদের আনাগোনা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। বেশিরভাগ প্রজাতির লার্ভা দশা জলে সম্পন্ন হলেও কয়েকটি প্রজাতির লার্ভা দশা সম্পন্ন হয় সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে স্থলে।

বেশির ভাগ প্রজাতিই প্রজননের আগে পরস্পরের মধ্যে প্রেম বিনিময় করে। এ ব্যাপারে উল্লেখ করতে হয় অ্যাগরিন স্প্লেনডেনস নামীয় প্রজাতি কথা। পুরুষেরা পরিণত হলে স্ত্রীপতঙ্গের জন্য অপেক্ষা করে ও ঐ অঞ্চল দিয়ে কোন স্ত্রীড্যামসেল উড়ে গেলে পুরুষটি নানা অঙ্গভঙ্গির দ্বারা তাকে আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে। পুরুষ পতঙ্গের অভ্যন্তরীণ যৌন অঙ্গ উদরের প্রান্তদেশে মুক্ত হয়। প্রজননের আগে তারা শুক্রাণুগুলি একটি বিশেষ সহকারী অঙ্গে সঞ্চয় কোরে রাখে যেটি অবস্থান করে উদরের সম্মুখ অংশে। প্রজননের সময় পুরুষটি স্ত্রীপতঙ্গের মস্তককে আঁকড়িয়ে ধরে ও উভয়েই দেহকে বাঁকিয়ে উদর দুটি সংলগ্ন করে। ঐ সময় সঞ্চিত শুক্রাণুগুলি স্ত্রীদেহে প্রবেশ করে। প্রজননের ঠিক পরেই স্ত্রীপ্রাণী জলজ উদ্ভিদের গায়ে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে প্রথমে সৃষ্টি হয় প্রোলার্ভা ও পরে ঐ প্রোলার্ভা খোলস পরিবর্তনের মাধ্যমে রূপান্তরিত হয় লার্ভাতে। লার্ভা থেকে রূপান্তরের দ্বারা সৃষ্টি হয় পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গ। কিছু প্রজাতিতে জীবন-চক্র সম্পন্ন করতে সময় লাগে প্রায় এক বছর, তবে বেশির ভাগ প্রজাতিই একবছরে বেশ কয়েকটি বংশ উৎপন্ন করতে পারে।

ঋতিংকর দত্ত

বেরিলিয়াম : অমরনাথ রায়

পর্যায় সারণীর চার নম্বর মৌলটির নাম 'বেরিলিয়াম'। বেরিলিয়াম একটি ধাতু এবং এর সঙ্গে অ্যালুমিনিয়াম এর রাসায়নিক ধর্মে যথেষ্ট মিল আছে।

1797 খ্রীস্টাব্দে M. Klaproth নামে এক জার্মান রসায়ন বিজ্ঞানী, রুশ কূটনীতিবিদ D. Golitsyn-এর কাছ থেকে কিছু পেরুদেশীয় পান্না (Emereld) উপহার লাভ করেন এবং তা বিশ্লেষণ করে দেখেন যে তাতে 66·25% সিলিকা, 31.25% অ্যালুমিনা এবং 0·5% আয়রন অক্সাইড আছে। এই শতকরা পরিমাণগুলিকে যোগ করলে মোট 98% হয়। তাহলে বাকি 2% কি জিনিস?—এর ব্যাখ্যা Klaproth দিতে পারলেন না। ফলে পর্যায় সারণীর চার নম্বর মৌলটি আবিষ্কারের কৃতিত্ব লাভ থেকে তিনি বঞ্চিত হলেন।

প্রায় একই সময়ে ফরাসী দেশে এক দক্ষ রসায়নবিজ্ঞানী L. Vaquelin বেরিল এবং এমারেল্ড নামক খনিজ পদার্থ-দুটিকে বিশ্লেষণ করছিলেন। তিনিও ঐ খনিজ দুটিতে সিলিকা, অ্যালুমিনা, আয়রন অক্সাইড ও লাইম-এর সন্ধান পেলেন। তিনি আরও লক্ষ্য করলেন যে, বেরিল এবং এমারেল্ড-এর কেলাসের আকৃতি প্রায় হুবহু এক; কিন্তু উপাদানে কি পার্থক্য—তা তিনি বলতে পারলেন না। তবে 1798 খ্রীস্টাব্দের 14ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 'প্যারিস অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস'-এ বেরিল বিশ্লেষণ সম্পর্কে এবং তাতে একটি সম্ভাব্য নতুন মৌলের উপস্থিতি সম্বন্ধে রিপোর্ট দাখিল করলেন Vaquelin। তাতে তিনি উল্লেখ করলেন যে নতুন মৌলটি এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয়নি বটে, কিন্তু সেটি অবশ্যই বেরিল খনিজে আছে। আবিষ্কার করতে না পারলেও Vaquelin অনাবিষ্কৃত মৌলটির নাম দিলেন Glucinium এবং তার চিহ্ন স্থির করলেন Gl. গ্রীক শব্দ Glykys মানে মিষ্ট। Glykys থেকে Glucinium নামটি এলো। ফরাসী রসায়নবিদ L. N. Vaquelin খনিজ বেরিল থেকে 'গ্লুসিনা' নামে মিষ্টস্বাদযুক্ত একটি যৌগকে পৃথক করেছিলেন। বেরিলিয়ামের লবণগুলির স্বাদ মিষ্ট বলে প্রথমে বেরিলিয়ামকে 'গ্লুসিনিয়াম' বলা হতো। এখন জানা গেছে যে, 'গ্লুসিনা' হলো বেরিলিয়াম অক্সাইড এবং 'বেরিল' হলো 'বেরিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট'। এই বেরিল থেকেই বেরিলিয়াম নামের উৎপত্তি হয়েছে।

এদিকে গটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিজ্ঞানের অধ্যাপক জার্মান বিজ্ঞানী I. Gmelin সাইবেরিয় বেরিল বিশ্লেষণ করে একই রকম ফল পেলেন এবং ঘোষণা করলেন যে L. Vaquelin-এর অনুমানই সত্যি। বেরিল খনিজে সত্যিই একটি অনাবিষ্কৃত মৌল রয়ে গেছে।

সকল ভাবনা চিন্তার অবসান ঘটলো 1828 খ্রীস্টাব্দে। ফ্রেডরিক ভোলার (F. Wohler) জার্মানীতে এবং E. Bussy ফ্রান্সে পৃথক পৃথক ভাবে বেরিলিয়াম আবিষ্কার করলেন। তাঁরা বেরিলিয়াম ক্লোরাইডের সঙ্গে ধাতব পটাসিয়াম এর বিক্রিয়া ঘটিয়ে সর্বপ্রথম বেরিলিয়াম প্রস্তুত করলেন। এরপর 1899 খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সের বিজ্ঞানী P. Lebeau সর্বপ্রথম তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ বেরিলিয়াম প্রস্তুত করলেন।

এরপর একে একে এই নতুন মৌলটির যাবতীয় ধর্ম ও ব্যবহার রসায়নবিদেরা চটপট আবিষ্কার করতে লাগলেন। মৌলটির চিহ্ন স্থির হলো Be. পরমাণু ক্রমাংক = 4, পারমাণবিক গুরুত্ব = 9, গলনাংক = 1285°C এবং স্ফুটনাংক = 2970°C।

প্রকৃতিতে বেরিলিয়াম মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না। এর প্রধান খনিজ হলো বেরিল। বিশুদ্ধ বেরিল বর্ণহীন কিন্তু পান্না (এমারেল্ড) ও অ্যাকোয়ামেরিন (Aquamarine) হলো অবিশুদ্ধ বেরিল। পান্না সবুজ বর্ণের হয় আর অ্যাকোয়ামেরিন-এর রং হরিদ্রাভ সবুজ। পান্না এবং অ্যাকোয়ামেরিন উভয়েই রত্ন পাথর হিসাবে অলঙ্কারে ব্যবহৃত হয়। বেরিলিয়ামের অন্যান্য খনিজের মধ্যে ইউক্লেজ (Euclase), ক্রায়সোবেরিল (Chrysoberyl) এবং ফেনাসাইট (Phenacite) অন্যতম।

সকল ক্ষারীয় মৃত্তিকা ধাতুর মধ্যে বেরিলিয়ামই হলো নিষ্ক্রিয়তম এবং সবচেয়ে কঠিন। ধাতুটি ধূসর বর্ণের এবং তড়িৎপরিবাহী। এর দুটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বা সমস্থানিক আছে। মানুষের রক্তে, ফুসফুসে ও মূত্রে সামান্য পরিমাণ বেরিলিয়াম থাকে। আগেকার দিনে যে সব লোক বেরিলিয়াম নিষ্কাশনের কাজ করতো তাদের অধিকাংশেরই বেরিলিয়ামের বিষক্রিয়া দেখা দিত এবং তাতে অনেকে মারাও যেতো।

বেলনাকার কাচের নলের মধ্যে একটুখানি পারদ রেখে তার ভিতর দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ পাঠালে ঐ নল থেকে আলোক রশ্মি ও অন্যান্য রশ্মি নির্গত হয়। এই সব রশ্মির মধ্যে কিছু অদৃশ্য এবং অতিশয় শক্তিসম্পন্ন। এদের বলা হয়

অতিবেগুনী রশ্মি।

কোন কোন খনিজ পদার্থ অতিবেগুনী রশ্মি শুষে নেয় এবং নানা রঙের আলোর আকারে ঐ শক্তিকে ফিরিয়ে দেয়। অতিবেগুনী রশ্মি সম্প্যাতে ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করার ক্ষমতাকে বলা হয় প্রতিপ্রভা বা ফ্লোরেসেন্স। যদি কাচের নলের ভেতরে বেরিলিয়ামের যৌগের গুঁড়ো দিয়ে প্রলেপ দেওয়া হয়, তবে ঐ প্রলেপ পারদের অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে প্রতিপ্রভ হয় এবং উজ্জ্বল শুভ্র আলো বিকিরণ করতে থাকে। এরই নাম প্রতিপ্রভ বাতি বা ফ্লোরেসেণ্ট বাতি। এই বাতি কম তাপ সৃষ্টি করে, উজ্জ্বলতর আলো দেয় ও কম বিদ্যুৎ খরচ করে।—এই রকম প্রতিপ্রভ বাতির কাচনল ভেঙ্গে গেলে এবং সেই ভাঙ্গা কাচে হাত কেটে গেলে যে ক্ষত সৃষ্টি হয় তা সহজে নিরাময় হয় না। এর কারণ, প্রতিপ্রভ বাতিতে ব্যবহৃত বেরিলিয়াম-এর লবণের গুঁড়োর প্রলেপ প্রচণ্ড বিষাক্ত। আজকাল অবশ্য ফ্লোরেসেণ্ট বাতিতে বেরিলিয়াম-এর পরিবর্তে অন্য প্রতিপ্রভ পদার্থ ব্যবহৃত হচ্ছে।

বেরিলিয়ামের উপর আলফা (α) কণার আঘাতে সর্বপ্রথম নিউট্রন আবিষ্কৃত হয়েছিল। পারমাণবিক চুল্লীতে বেরিলিয়াম ও তামার সংকর ধাতু ব্যবহৃত হয়। এই সংকর ধাতু অচুম্বকীয় পদার্থ এবং তামার চেয়ে অনেক মজবুত বলে ক্যামেরার সাটার (Shutter) এবং কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়। এক্স-রে যন্ত্রের জানালার কপাটে বেরিলিয়ামের পাত ব্যবহার করা হয়, কারণ 'এক্স-রে' বেরিলিয়ামের পাত ভেদ করে সহজেই চলে যেতে পারে। বেরিলিয়াম হাল্কা ধাতু, অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক এবং অধিক তাপে অক্ষত থাকতে পারে বলে এই ধাতুকে উড়োজাহাজ এবং ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণে ব্যবহার করা হয়।

এই প্রবন্ধ রচনায় যে সব গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে ঃ

(1) Chemical elements : how they were discovered By D. N. Trifonov and V. D. Trifonov.

(2) মহাবিশ্বের মৌল উপাদান ঃ আইজ্যাক এসিমোভ

(3) একশো তিনটি মৌলিক পদার্থ ঃ কানাইলাল মুখোপাধ্যায়।

এঁদের কাছে আমি ঋণী।

ইন্দা, খড়্গপুর, মেদিনীপুর

IX-X শ্রেণীর গল্প প্রতিযোগিতায় তৃতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা

অভিযান ঃ বিমান বসু

ক্যাপটেন নিমো আমরা প্রায় গন্তব্যস্থলের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। Alfa Sanetory X গ্রহমণ্ডলীর তৃতীয় গ্রহ 'কিউরাস-নিম্মো, থেকে আমাদের দূরত্ব 1·5 আলোকবর্ষ। Autolanding-এর সব কাজ পাকা। তবে বায়ুমণ্ডলে যদি আমাদের পক্ষে কোন ক্ষতিকারক গ্যাস পাওয়া যায় তবে আমাদের ওখানে নামার কোন যুক্তি নেই।

মি. ঝাও-এর গলা শোনা গেল, "না-না ক্যাপটেন পাইলট মি. কোনার Computer-কে ঐ গ্রহ সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য দিয়েছে এবং Computer তা বিশ্লেষণ করে সন্তোষজনক মতামত দিয়েছে।

ঠিক আছে, আমি আর তুমি ঐ গ্রহে নামবো আর মি. কোনার র‍্যালিকে নিয়ে কিউরাস-নিম্মোর চারিদিকে পরিভ্রমণ করবে। যাও মি. কোনারকে সব জানিয়ে দাও। এদিকে আমি গ্রহে নামার অটো-মনিটর ক্যাপসুলটা ঠিক করছি।

Alfa Sanetory X গ্রহমণ্ডলীর তৃতীয় গ্রহ কিউরাস-নিম্মোতে জীবনের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। আজই বোধহয় তা হাতেকলমে প্রমাণিত হবে।

যাই হোক, নামার সব কাজ শেষ হলে তিনি ও মি. ঝাও দুটো করে অম্লযান বড়ি খেয়ে নিলেন ও দুটো লেসার-গান নিয়ে রাখলেন যাতে কোন রকম ঝুঁকি না নেওয়া হয়।

সর্বপ্রথম ক্যাপটেন নিমো ও তারপর মি. ঝাও কিউরাস নিম্মোর বুকে পা রাখলেন।

ওদিকে মি. কোনার র‍্যালিকে নিয়ে পরিভ্রমণ কালে একটি অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করলেন। তিনি দেখলেন যে গ্রহটির বুকে কয়েক জায়গায় কিছুটা করে থলথলে জেলি ছড়িয়ে আছে। কিন্তু সব থেকে বড় কথা ওগুলো জীবন্ত। মনে মনে উনি বেশ আশঙ্কিত হলেন।

এদিকে ওরা গ্রহটিতে নেমে কিছু প্রাথমিক কাজ সেরে নিয়ে গ্রহটির বুকে একটি ট্রান্সমিটার বসাবার কাজ করছেন। এদিকে ঐ জেলিগুলি যে ওদের চারদিক দিয়ে এগিয়ে আসছে তা ওরা খেয়াল করেনি। খেয়াল হল তখন, যখন মি. কোনার র‍্যালি থেকে লেসার বিম চার্জ করতে শুরু করেছে। ভয়ে ওরা তাড়াতাড়ি ক্যাপসুলে উঠে পড়লেন। কিন্তু ঐ জেলি তখন ওদের সারা ক্যাপসুলটাকে আবৃত করেছে। তাই ক্যাপটেন নিমো একটু বেশি মাত্রায় ওদের এক বৈদ্যুতিক শক দিলেন। অবাক হয়ে তারা দেখলেন যে ঐ জীবন্ত জেলী মুহূর্তেই বাষ্পীভূত হয়ে গেল। ক্যাপসুলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে র‍্যালির সঙ্গে যুক্ত হল। সভয়ে ক্যাপটেন নিমো ও মি. ঝাও দেখলেন যে মি. কোনার অতি শক্তিশালী সুপার চার্জার চার্জ করল। ধ্বংস হয়ে গেল Alfa Sanetory X গ্রহমণ্ডলীর তৃতীয় গ্রহ কিউরাস নিম্মো।

বি জোন, দুর্গাপুর

সালোকসংশ্লেষ ঃ কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর

অশোককুমার গায়েন

1. সালোকসংশ্লেষ কাকে বলে ?

* যে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ সূর্যালোকের উপস্থিতিতে মাটি থেকে শোষিত জল, বাতাস থেকে গৃহীত কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2)-এর সাহায্যে ক্লোরোফিলযুক্ত কোষে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে তরল শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে এবং গৃহীত কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সম-পরিমাণ অক্সিজেন বাতাসে পরিত্যাগ করে, সেই পদ্ধতিকে সালোকসংশ্লেষ বলে।

2. সালোকসংশ্লেষ কখন এবং কোথায় হয় ?

* উদ্ভিদদেহে ক্লোরোফিলযুক্ত প্রতিটি সজীব কোষে দিনের বেলায় সূর্যালোকের উপস্থিতিতে হয়।

3. পত্ররন্ধ্র কোথায়অবস্থিত এবং কাজ কি ?

* দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের পাতার নিম্নবহিঃত্বকে এবং একবীজ পত্রী উদ্ভিদের উভয় বহিঃত্বকেই পত্ররন্ধ্র অবস্থিত। পাতার মধ্যে O_2, CO_2, জলীয় বাষ্প, সূর্যালোক প্রভৃতি যাতায়াত করতে দেওয়া পত্ররন্ধ্রের কাজ।

4. প্রহরী কোষ কোথায় থাকে এবং কাজ কি ?

* পত্ররন্ধ্রের দুপাশে দুটি প্রহরী কোষ থাকে। ঐ দুটি কোষের সংকোচন এবং প্রসারণ দ্বারা পত্ররন্ধ্রের উন্মোচন এবং বন্ধ হওয়া নির্ভর করে।

5. ক্লোরোফিল কয়প্রকার ও কি কি ?

* চার প্রকার, ক্লোরোফিল এ, ক্লোরোফিল বি, ক্যারোটিন এবং জান্থোফিল।

6. সালোক সংশ্লেষ চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি কোথা থেকে আসে ?

* সূর্যালোকের লাল ও অতিবেগুনী রশ্মি থেকে সংগৃহীত ফোটন কণা থেকে।

7. স্ট্রোমা এবং গ্রানা কি এবং এদের কাজ কি ?

* ক্লোরোপ্লাস্টের দুইটি অংশ—স্ট্রোমা এবং গ্রানা, গ্রানাতে আলোক দশা ও স্ট্রোমাতে অন্ধকার দশার কাজ হয়।

8. উদ্ভিদ মূলরোম দ্বারা শোষিত খাদ্যরস কোথায় সঞ্চিত রাখে ?

* পাতার মেসোফিল কলার মধ্যে।

9. সালোকসংশ্লেষের কয়টি দশা এবং কি কি ?

* সালোকসংশ্লেষের দুইটি দশা—আলোক দশা ও অন্ধকার দশা।

10. অন্ধকার দশা কি রাত্রিবেলায় হয় ? বা সালোক সংশ্লেষ কি রাত্রিবেলায় হয় ?

* না, তবে কৃত্রিম জোরালো আলোকে কিছু পরিমাণ সালোকসংশ্লেষ হয়।

11. সালোকসংশ্লেষকে অঙ্গার-আত্তীকরণ বলে কেন ?

* এই প্রক্রিয়ায় বাতাসের CO_2-এর কার্বন বা অঙ্গার গ্লুকোজ তৈরির সময়ে ব্যবহৃত হয় এবং এই প্রক্রিয়াটি সালোক-সংশ্লেষ চলাকালীন ঘটে বলে সালোকসংশ্লেষকে অঙ্গার-আত্তীকরণ বলে।

12. ফটোলিসিস কাকে বলে ?

* যে প্রক্রিয়ায় সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ক্লোরোফিল সক্রিয় হয়ে পাতার মেসোফিল কলায় সঞ্চিত জল (H_2O)কে H^+ ও OH^- আয়নে ভেঙে দেয়, সেই প্রক্রিয়াকে ফটোলিসিস বলে।

13. কোন দশা উৎসেচকের উপর নির্ভরশীল ?

* অন্ধকার দশা।

14. এক অণু গ্লুকোজের মধ্যে কত পরিমাণ সৌর শক্তি থাকে ?

* 674 কিলো ক্যালরি।

15. সালোকসংশ্লেষে উদ্ভূত O_2-এর উৎস কি ?

* সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী জল থেকে।

16. জলজ উদ্ভিদেরা CO_2 কোথা থেকে এবং কিভাবে সংগ্রহ করে ?

* জলে দ্রবীভূত CO_2 গ্রহণ করে জলে নিমজ্জিত অংশ দ্বারা।

17. প্রাণীরা কেন সালোকসংশ্লেষে সমর্থ নয় ?

* প্রাণীদের শরীরে ক্লোরোপ্লাস্ট কণিকা না থাকার জন্য।

18. কোন্ কোন্ প্রাণী সালোকসংশ্লেষে সমর্থ ?

* ইউগ্লিনা ও ক্লাইস্যামিবা।

19. সালোকসংশ্লেষের উপযোগী উষ্ণতার পরিমাণ কত ? এবং কত উষ্ণতায় ভাল হয় ?

* 20°C থেকে 45°C উষ্ণতায় সালোকসংশ্লেষ হয় তবে 37°C উষ্ণতায় সবচেয়ে ভাল হয়।

20. কোন্ পদার্থ সৌরশক্তিকে শৃঙ্খলিত করে ?

* ATP।

21. প্রয়োজনীয় উপাদান থাকা সত্ত্বেও কেন সালোক-সংশ্লেষ মন্দীভূত হয় ?

* যদি উৎপন্ন গ্লুকোজ এবং উৎপন্ন O_2 উদ্ভিদকোষের মধ্যে সঞ্চিত থেকে যায়।

22. অন্ধকার দশার অন্তর্বর্তী পদার্থ কি কি ?

* রাইবিউলোজ-ডাই-ফসফেট (RUDP), ফসফো-গ্লিসারিক অ্যাসিড (PGA), ফসফোগ্লিসারালডিহাইড (PGALD)।

23. H_2 বহনকারী উৎসেচকের নাম কি ?

* NADP।

24. ATP-কে কেন এনার্জি কারেন্সি বলে ?

* জীবকোষে একমাত্র ATP অণুর মধ্যে শক্তি সঞ্চিত থাকতে পারে বলে।

25. হিল বিক্রিয়া ও হিল বিকারক কাকে বলে ?

* 19-0 খ্রীস্টাব্দে বিজ্ঞানী রোবিন হিল ফটোলিসিস প্রক্রিয়া অর্থাৎ সক্রিয় ক্লোরোফিল জলকে H^+ ও OH^- আয়নে বিশ্লিষ্ট করে তা ব্যাখ্যা করেন বলে ফটোলিসিসকে হিল বিক্রিয়া বলে। ফটোলিসিসে উৎপন্ন H_2-কে NADP বহন করে বলে NADP-কে হিল বিকারক বলে।

26. ব্লাকম্যান (Blackman) বিক্রিয়া কাকে বলে ?

* অন্ধকার দশায় Co_2-এর সংবন্ধন এবং বিজারণ ক্রিয়া ঘটে। তাছাড়া এই দশায় সূর্যালোক উপস্থিত থাকলেও প্রয়োজন হয় না, এই ঘটনা বিজ্ঞানী ব্লাকম্যান (1905) লক্ষ্য করেন, তাই এই বিক্রিয়াকে ব্লাকম্যান বিক্রিয়া বলে।

27. কেলভিন চক্র কাকে বলে ?

* অন্ধকার দশায় যে রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি সংঘটিত হয় অর্থাৎ রাইবিউলোজ-ডাই ফসফেট (RUDP) Co_2-এর সহায়তায় ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড (PGA), পরে H_2-এর সহায়তায় ফসফোগ্লিসারালডিহাইড (PGALD) উৎপন্ন করে. পরে দুই অণু PGALD, ATP এর সাহায্যে এক অনুগ্লুকোজ এবং বাকি দশ অণু PGALD বিভিন্ন অন্তর্বর্তী যৌগের মাধ্যমে পুনরায় ছয় অণু RUDP উৎপন্ন করে। এই চক্রটি বিজ্ঞানী কেলভিন প্রথম পর্যবেক্ষণ করেন বলে একে কেলভিন চক্র বলে।

28. সালোকসংশ্লেষের প্রভাবক কি কি ?

* বাহ্যিক—আলো, Co_2, জল, উষ্ণতা, O_2, রাসায়নিক পদার্থ ও পাতার বয়স, অভ্যন্তরীণ ক্লোরোফিল, উৎসেচক, প্রোটোপ্লাজম ও পাতার অন্তর্গঠন।

29. কোরেল্লা কি ? এর বৈশিষ্ট্য কি ?

* এক প্রকার শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ, এরা প্রতি 12 ঘণ্টায় কোষের সংখ্যা দ্বিগুণ করতে পারে, তাই দ্রুত বৃদ্ধি হয়।

30. উদ্ভিদ কিভাবে দূষিত বায়ুকে বিশুদ্ধ করতে পারে।

* জীবদেহে শ্বাসকার্যের ফলে উৎপন্ন Co_2 বাতাসে আসে। ঐ Co_2 উদ্ভিদ নিয়ে সালোকসংশ্লেষ করে O_2 বাতাসে ছাড়ে এবং বায়ুমণ্ডলকে বিশুদ্ধ রাখে।

31. কোনো উদ্ভিদকে শ্বেতসারবিহীন করার উপায় কি?

* ঐ উদ্ভিদকে 24 ঘণ্টা অন্ধকার ঘরে রাখলে পাতায় সঞ্চিত শ্বেতসার ব্যয়িত হয়ে উদ্ভিদ শ্বেতসার মুক্ত হবে।

32. সালোকসংশ্লেষ না হলে প্রাণীদের কি ক্ষতি হত ?

* প্রাণীরা তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু ও শ্বসনের জন্য O_2 পেত না।

33. সালোকসংশ্লেষের ফলে উদ্ভিদ থেকে আমরা কি কি উপকার পাই ?

* প্রধানতঃ O_2 পাই, তাছাড়া তুলা, রেয়ন, কাগজ, গঁদ, রজন, রবার, বিভিন্ন প্রকার ঔষধ, কয়লা, পেট্রোলিয়াম, ফিল্ম সেলোফেন কাগজ প্রভৃতি পাই।

সূর্যালোক (674 কিলো ক্যা.)

34. সালোকসংশ্লেষের পূর্ণ রাসায়নিক সমীকরণ কি ?

* $6Co_2 + 12H_2O \mid C_6H^{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2$
(কার্বন ডাই-অক্সাইড) (জল) ক্লোরোফিল (গ্লুকোজ) (জল) (অক্সিজেন)

বিজয়নগর, ভায়া গোসাবা, 24 পরগনা (দঃ)

পুজো সংখ্যায়

তিনটি দুর্ধর্ষ উপন্যাস লিখবেন

অদ্রীশ বর্ধন ॥ ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

এবং সমরজিৎ কর

শারদীয় কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান বেরোবে

মহালয়ার আগে

যে যন্ত্রটি যুদ্ধজয় করেছিল

আইজ্যাক অ্যাসিমভ

অনুবাদ- সৌরেন ভট্টাচার্য

বিজয় উৎসব চলবে অনেকদিন ধরে। সর্বত্রই একটা উৎসবের মেজাজ। এমনকি যন্ত্রদানব 'মাল্টিভ্যাকের' প্রকোষ্ঠগুলির হাওয়াতেও সেই আমেজ জড়ানো।

অন্যসব কিছুর কথা যদি নাও ধরি, তাহলেও সেখানকার নির্জনতা এবং নিস্তব্ধতা বুঝিয়ে দেয় যে যুদ্ধ থেমে গেছে। এক যুগের মধ্যে এই প্রথম যন্ত্রবিদরা এই দৈত্যাকার কম্প্যুটারের প্রধান অংশগুলোর তদারকির জন্য ছোটাছুটি করা বন্ধ করেছে। বিভিন্ন রঙের হালকা আলোগুলো টিপটিপ করে অদ্ভুত নক্সায় জ্বলা-নেবা বন্ধ করেছে। খবরের স্রোত বাইরে থেকে ভেতরে ঢুকছে না, কিংবা ভেতর থেকে বাইরে যাচ্ছে না।

যন্ত্রটা হয়ত বেশিদিন থেমে থাকবে না, কারণ এখন শান্তির প্রয়োজনে কাজ আরও বাড়বে। তবুও সপ্তাহ খানেক অন্ততঃ কয়েকটা দিন এই বিজয় পালন করার এবং বিশ্রাম নেওয়ার দাবী এই 'মাল্টিভ্যাকেরও থাকতে পারে।'

'ল্যামার' সুইফট মাথা থেকে সামরিক টুপিটা খুলতে খুলতে এই সুবিশাল কম্প্যুটারের মূল বারান্দার উপর চোখ বুলিয়ে নিলেন। তিনি বেশ ক্লান্তভাবে যন্ত্রবিদ্‌দের আসনে বসেছিলেন। পরনের সামরিক উর্দিটার অবস্থাও সঙ্গীন। অবশ্যই এই উর্দিপরাটা তিনি কখনোই পছন্দ করতেন না। তিনি বললেন, "আমার মনটা কেমন খারাপ লাগছে। এই ডেনিবদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে কোন দিন কেটেছে কিনা তা স্মরণ করতেও কষ্ট হয়। এই শান্তিতে বসবাস করা কিংবা উদ্বেগবিহীন মনে আকাশের তারার দিকে চেয়ে থাকা— এসবই কেমন যেন প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে বলে মনে হয়।"

সোলার ফেডারেশনের কর্মাধিকর্তা সুইফটের সঙ্গে আর যে দুজন তখন ছিলেন তারা কিন্তু তাঁর থেকে বয়সে ছোট। চুলও ততটা পাকেনি। আর খুব ক্লান্তও মনে হচ্ছিল না তাদের।

জন হেণ্ডারসন একটু ঠোঁট পাতলা লোক। এই জয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে ভাব মুক্তির অনুভূতি তার হচ্ছিল তা তিনি চেপে রাখতে পারলেন না। "ওদের ধ্বংস করতে পেরেছি। সব শেষ! এই কথাটাই আমার বার বার মনে হচ্ছে। এখনও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না! কিন্তু কতগুলো বছর ধরে আমরা ক্রমাগত পৃথিবীর এবং মানবজাতির চরমতম বিপদের কথা নিয়ে আলোচনা করেছি! এবং সেই বিপদের সম্ভাবনা এতদিন কালোমেঘের মত ঘিরে রেখেছিল আমাদের। কিন্তু আমরা এখনও বেঁচে আছি। আর ডেনেবীরা সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তারা আর কোনদিনই পৃথিবীর সামনে বিপদের সূচনা করতে পারবে না।"

সুইফট নির্লিপ্ত জ্যাবলনৃষ্কির দিকে শান্তভাবে তাকালেন।

জ্যাবলন্স্কির গোটা যুদ্ধের সময় জুড়ে এই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার মুখ্য ব্যাখ্যাকর্তা হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। অবিচল জাবলন্স্কির দিকে শান্ত চোখে তাকিয়ে সুইফট বললেন, "এর জন্য মাল্টিভ্যাককে ধন্যবাদ। ঠিক কিনা, ম্যাক্স?"

উত্তরে জ্যাবলনস্কি কাঁধ ঝাঁকালেন। আনমনে একটা সিগারেট বার করলেন, আবার রেখে দিলেন। এই যন্ত্রদানবের পেটের ভেতরে যে কয়েক হাজার লোক কাজ করছিল এতদিন তাদের মধ্যে কেবলমাত্র তাঁরই এখানে বসে ধূমপান করার অধিকার ছিল। তবুও শেষের দিকে এই বিশেষ সুবিধে নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ডান কাঁধের ওপর দিয়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করে তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, ওরা তো তাই বলে।"

"কি ম্যাক্স! হিংসে হচ্ছে?"

"কেন? সকলে মাল্টিভ্যাকের নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে বলে? নাকি মানুষ এই যুদ্ধে মাল্টিভ্যাককে পরিত্রাতা বলে মানছে বলে?" জ্যাবলনস্কির মুখে যেন একটু বিদ্রূপের আভাস।

"তাতে আমার কি যায় আসে? সকলে যদি খুশি হয়, তাহলে মাল্টিভ্যাককে যুদ্ধ-জয়ী যন্ত্রদানব হিসেবে মেনে নিলেই হ'ল।"

হেণ্ডারসন অন্য দু'জনের দিকে একটু টেঁরিয়ে দেখে নিলেন। তারপর যেন আপনমনে উচ্চারণ করলেন, "যুদ্ধে জয়ের ব্যাপারে মাল্টিভ্যাকের কোনো ভূমিকা ছিল না। এটা একটা যন্ত্রমাত্র।"

"হ্যাঁ —একটা বিশাল যন্ত্র," সুইফট সায় দেন।

"কেবল একটা বিশাল যন্ত্র মাত্র। যতটুকু তথ্য একে সরবরাহ করা হয়েছে ততটুকুই এর কেরামতি, ততটুকুর ওপর সরবরাহ নির্ভর করেছে, এটুকু বলেই থমকে গেলেন হেণ্ডারসন। যেন মুখ ফসকে কিছু একটা বেরিয়ে গেছে।

জ্যাবলনস্কি তার দিকে তাকালেন। হাতের মোটামোটা আঙুলগুলো আবার সিগারেট বের করতে গিয়েও থেমে যায়।" সে তো তোমারই জানার কথা। তথ্য তো তুমিই করতে। নাকি তুমি তাই এখন সব কৃতিত্বটুকু নিজে নিতে চাইছ?"

হেণ্ডারসন একটু রেগেই গেলেন। "না! ওর কোনো কৃতিত্বই নেই। মাল্টিভ্যাক কি ধরনের তথ্য কাজে লাগাত —সে সম্পর্কে তুমি কতটুকু জান? পৃথিবী, চাঁদ, মঙ্গলগ্রহ এবং এমনকি টাইটানের শ'খানেক কম্প্যুটার থেকে সংগৃহীত হ'তো এই তথ্যগুলি। টাইটান থেকে তথ্য পেতে সব সময় দেরী হ'ত। আর খালি মনে হ'ত ওখান থেকে সংগৃহীত তথ্য উল্টেপাল্টা ঝামেলা সৃষ্টি করবে।"

"এতে তো যে কেউ পাগল হয়ে যাবে," সুইফটের গলায় সহানুভূতির ছোঁয়া।

হেণ্ডারসন মাথা নাড়লেন। "শুধু তাই নয়। স্বীকার করতে বাধা নেই যে আট বছর আগে যখন প্রধান পরিকল্পনাকারীর পদে লেপ্টেনের স্থলাভিষিক্ত হলাম তখন খানিকটা ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। যদিও তখন সব কাজেই একটা আনন্দ পাওয়া যেত। তাছাড়া তখনও যুদ্ধ দূর-পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বেশ যেন একটা বিপদের ভয় ছাড়া রোমাঞ্চকর অনুভূতি। সৈন্য বোঝাই মহাকাশযান পাঠান তখনও শুরু হয়নি কিংবা আন্তর্জাগতিক ক্ষেপণাস্ত্রের ততটা প্রচলন হয়নি। ঠিক মত নিশানা করতে পারলে এই সব অস্ত্র এক একটা গ্রহকেও গিলে ফেলতে পারত। আর এমন সময়েই কিনা আসল ঝামেলা শুরু হ'ল—। তোমরা এত সবের কিছুই জান না।" শেষ কথাগুলো একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বললেন।

সুইফট বললেন, "বেশ তো! এখন তো যুদ্ধ শেষ। আমরা জয়লাভ করেছি। এখন সব খুলে বল।"

হেণ্ডারসন আবার মাথা নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তা ঠিক!" যেন হঠাৎ মনে হল যুদ্ধে পৃথিবীর জয় হয়েছে। অতএব বলা যায় যা কিছু এতকাল হয়েছে তা ভালর জন্যই হয়েছে। বললেন, "শেষের দিকে কোনো অঙ্ক, কোনো তথ্যের অর্থ ছিল না।"

"অর্থহীন? তুমি কি বুঝে শুনে বলছ কথাটা?" জ্যাবলনস্কি অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন।

"আক্ষরিক অর্থে অর্থহীন। তোমরা কি আশা করেছিলে? তোমাদের দুজনের সমস্যাটা হচ্ছে তোমরা কখনও সবটা তলিয়ে দেখনি। বিশাল মাল্টিভ্যাকের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে ম্যাক্স কখনো বাইরে বেরোয় নি। আর তুমি, ডিরেক্টর সাহেব, কখনোই প্রাসাদের চৌহদ্দির বাইরে যেতে চাইতে না। যখন কোনো দেশ সফরে যেতে তখন সকলে তোমার মন-পসন্দ তথ্য তোমার সামনে হাজির করত।"

সুইফট মন্তব্য করলেন, "তুমি যতটা ভাবছ, অতটা অজ্ঞ আমি ছিলাম না।"

"তুমি কি জানো," হেণ্ডারসন বলতেই থাকেন, "যুদ্ধের মাঝামাঝি সময় থেকে আমাদের উৎপাদনের ক্ষমতা, কাঁচামালের যোগান, শিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্যসংখ্যা—যুদ্ধের কাজে যা কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য এই সব যন্ত্র-গণকগুলো সরবরাহ করত তার সবই বিশ্বাসের অযোগ্য এবং অবাস্তব হয়ে উঠেছিল? সামরিক এবং অসামরিক কর্তাব্যক্তিরা সকলেই নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছিল। ফলে, যা কিছু খারাপ তাকে চেপে দিয়ে সামান্য ভাল খবরকে বিরাট করে দেখাত। এই সব যন্ত্রগুলো যে খবরই দিক না কেন, নিজেদের পিঠ বাঁচানোর তাগাদায় যন্ত্রবিদ্‌রা তার মনগড়া ব্যাখ্যা দিতেন। এ জিনিস থামানোর কোনো রাস্তা ছিল না। অনেক চেষ্টা করেছি, পারিনি।"

জ্যাবলনস্কি শেষ পর্যন্ত একটা সিগারেট না ধরিয়ে পারেন না। "কিন্তু আমার তো মনে হয়, মাল্টিভ্যাককে তুমিই তথ্য সরবরাহ করতে তোমার কার্য-পরিকল্পনা প্রস্তুত করার

তাহলে কীভাবে সামাল দিয়েছ তুমি ?……

জন্য। তখন তো এগুলো বিশ্বাসের অযোগ্য বলে আমাদের জানাওনি।"

"কি করে জানাব ? যদি জানাতামও, তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করতে ?" হেণ্ডারসন বেশ রেগে পাল্টা প্রশ্ন করেন। "আমাদের গোটা যুদ্ধ প্রচেষ্টাই মাল্টিভ্যাককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। আমাদের এই বিশাল সমর উপকরণের মত ডেনেববাসীদের কিছুই ছিল না। অতএব মাল্টিভ্যাক যে ডেনেববাসীদের যে কোন আক্রমণ পরিকল্পনা আগে থেকেই ধরে ফেলবে এবং আমাদের প্রতিকারের রাস্তা বাৎলে দেবে তা সকলেই বিশ্বাস করত। ওই চরম বিপদের মুহূর্তে এর থেকে বেশি মানসিক শক্তি আর কি থেকে পাওয়া যেত ? মহা অন্তরীক্ষে থেকে আমাদের গোয়েন্দা-যানগুলি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর ডেনেববাসীদের সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্য আমরা পাইনি যেগুলি আমরা মাল্টিভ্যাককে সরবরাহ করতে পারতাম। এ সব কথা তো সকলকে জানানো যায় নি।"

সুইফট্ বললেন, "এ সব খুবই খাঁটি কথা।"

"তাহলেই বোঝ," হেণ্ডারসন থামতেই চায় না, "তখন যদি বলতাম তথ্যগুলি সব বাজে, তাহলে আমাকে অবিশ্বাস করে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া ছাড়া কোন রাস্তা তোমাদের থাকত না। আমি তা হতে দেইনি।"

"তাহলে কী ভাবে সামাল দিয়েছ তুমি ?" জ্যাবলনৃষ্কি প্রশ্ন করেন।

"যুদ্ধে যখন জয় হয়েছে, তখন কি করে সামাল দিতাম তা বলতে বাধা নেই। কম্প্যুটারের বিশ্লেষণকে আমি শুধরে দিতাম।"

"কি ভাবে ?" সুইফট্ জানতে চান।

"মনে হয় অন্তর্দৃষ্টি। বিশ্লেষিত তথ্যগুলো নিয়ে নানা ভাবে সাজিয়ে দেখতাম যতক্ষণ না বিশ্বাসযোগ্য মনে হ'ত। প্রথম প্রথম বেশ ভয় হ'ত। তখন যেগুলো একেবারেই অবাস্তব বলে মনে হ'ত সেগুলোই শুধু সংশোধন করতাম। তারপর যখন দেখতাম এর ফলে কোন ক্ষতি হ'ল না, তখন খানিকটা সাহস হ'ল। শেষের দিকে কোন বৈজ্ঞানিক তথ্যের পরোয়াই করতাম না। যেমন দরকার সেই রকম ব্যাখ্যা জুড়ে দিতাম। এমন কি মাল্টিভ্যাক সংলগ্ন প্রকোষ্ঠে নিজের পরিকল্পিত কার্যসূচী অনুযায়ী তথ্য তৈরি করে নিতাম।"

"এলোমেলো, যা খুশি সংখ্যা আর তথ্য সরবরাহ করেছ নাকি ?" জ্যাবলনৃষ্কি জিজ্ঞেস করলেন ?

"মোটেই না। আমি নিজে একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করে নিয়েছিলাম।"

হঠাৎই জ্যাবলনৃষ্কি হেসে উঠলেন। গভীর চোখ দুটো চকচক্ করে উঠল। "মাল্টিভ্যাকের সংলগ্ন প্রকোষ্ঠ যে বেআইনিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে সে সম্পর্কে তিনবার আমার কাছে অভিযোগ এসেছিল। তিনবারই চেপে দিয়েছি। তেমন গুরুত্বপূর্ণ হলে তোমাকে ধরতে আমার দেরী হত না। কিন্তু সত্যি বলতে কি সে সময় মাল্টিভ্যাক সংক্রান্ত কোন কিছুরই গুরুত্ব আমার কাছে ছিল না।"

"কোন গুরুত্ব ছিল না বলতে কি বোঝাতে চাইছ ?" হেণ্ডারসন সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করেন।

"কোন গুরুত্বই ছিল না। ব্যাপারটা তখন তোমাকে বললে তোমার মানসিক ভার কমত। আর তাহলে তুমি

তোমার অপকর্ম সম্পর্কে আমাকে বলতে। আমারও ভার কমত। মাল্টিভ্যাক যে ঠিকমত কাজ করছিল এমন ধারণা তোমার কেন হ'ল?"

"কি বলছ, ঠিক মত কাজ করছিল না?" সুইফট বাধা দেন।

"সত্যিই বলছি। তাছাড়া তুমিই বল, যুদ্ধের শেষদিকে আমার প্রয়োগবিদ্‌রা কোথায় ছিল? তারা তখন মহাকাশ সম্পর্কে হাজার রকম তথ্য অন্য সব কম্প্যুটারগুলোকে সরবরাহ করছিল। ফলে, কিছু আনাড়ী, আর কিছু বুড়ো হাবড়া নিয়ে কাজ করতে হয়েছিল। তাদের ওপর আমার কোনো আস্থা ছিল না। মাল্টিভ্যাককে যে তথ্য সরবরাহ করা হত তা বিশ্বাসযোগ্য ছিল কিনা তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা ছিল না। তবে তার বিশ্লেষণে বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব ছিল।"

"তুমি তখন কি করলে?" হেণ্ডারসন জিজ্ঞেস করল।

"জন, আমিও ঠিক তোমার মতই করলাম। আমি একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করলাম। আমার বিবেক অনুযায়ী আমি বিশ্লেষণগুলিকে সাজিয়ে নিতাম—আর এইভাবেই এই যন্ত্র দানব যুদ্ধ জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করেছে।"

সুইফট এবার চেয়ারের উপরে গা এলিয়ে দিয়ে বসলেন। পা দুটো মেলে দিলেন সামনের দিকে। "কি সাংঘাতিক স্বীকারোক্তি সব! তাহলে এতক্ষণে বোঝা যাচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমাকে যে সমস্ত মালমশলা সরবরাহ করা হ'ত তা ছিল মানুষের তৈরি সংখ্যা ও তথ্যের মানুষের তৈরি ব্যাখ্যা। ঠিক কিনা?"

"তাই তো দেখা যাচ্ছে।" জ্যাবলনৃষ্কি মাথা নাড়েন। সুইফট বললেন, "অতএব এখন মনে হচ্ছে ঐ সব খবরের ওপর কোনো গুরুত্ব আরোপ না করে ঠিকই করেছিলাম।"

"তুমি সত্যিই গুরুত্ব দাওনি? জ্যাবলনৃষ্কি এই মুহূর্তে যে স্বীকারোক্তি করেছিলেন; তা যেন ভুলে গেছেন। তার পেশাগত অহং বোধে আঘাত লেগেছে।

"না, দিতে পারিনি। মাল্টিভ্যাক হয়ত কখনও কখনও নির্দেশ দিয়েছে—এখানে নয় সেখানে আক্রমণ কর, এটা কর, সেটা করবে না; অপেক্ষা কর, এগুলোর দরকার নেই। কিন্তু মাল্টিভ্যাক সত্যি সত্যি কি বলছে বা বলতে চাইছে, আর তার অর্থই বা কি তা আমি বুঝতেই পারতাম না।"

জ্যাবলনৃষ্কি বললেন, "কিন্তু চূড়ান্ত বিশ্লেষণ তো সব সময়ই খুব সাদামাটা ভাষায় লেখা হ'ত।"

"সাদামাটা ছিল তাদের কাছে যাদের শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হ'ত না। আমার কাছে সেগুলো অত সরল ছিল না। সিদ্ধান্তগুলি নেওয়ার যে বিরাট দায়িত্ব তার বোঝা প্রায় অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। এমন কি মাল্টিভ্যাকও সেই বোঝা হালকা করতে পারেনি। যাই হোক, মোদ্দা কথা হ'ল তথ্যগুলো সম্পর্কে আমার সন্দেহ ছিল। এবং তা ঠিক প্রমাণিত হওয়ায় কি বিরাট স্বস্তি পেলাম।"

এই রকম গোপন স্বীকারোক্তির আসরে জ্যাবলনৃষ্কি নিজেকে ঠিক সামলাতে পারলেন না। ডিরেক্টরের নাম ধরেই প্রশ্ন করল।

"কিন্তু ল্যামার, তুমি তো সিদ্ধান্ত নিতে! নিতেই হ'ত। কিন্তু কি ভাবে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে? কি উপায়ে?"

"এবারে ফিরতে হবে—কিন্তু তার আগে তোমাদের সব খুলে বলছি। আমি একটা কম্প্যুটারের সাহায্য নিতাম, খুব পুরোনো কম্প্যুটার। মাল্টিভ্যাকের তুলনায় অনেক পুরোনো।"

এই বলে তিনি পকেটে হাত ঢোকালেন সিগারেটের জন্য। পকেট থেকে একটা প্যাকেট আর কিছু খুচরো পয়সা বের করে আনলেন। পয়সাগুলো যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময়কার। তারপর তো ধীরে ধীরে ধাতু দুর্লভ হ'ল। পয়সার বদলে খবরের কাগজের প্রচলন হয়েছে এখন। সুইফট যেন একটু সংকোচের সঙ্গে হাসলেন। "এগুলো এখনও আমার ভাল লাগে। তাছাড়া যৌবনের অভ্যাসগুলো অনেক বৃদ্ধই ত্যাগ করতে পারে না।" তিনি সিগারেটটা ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে দিয়ে খুচরো পয়সাগুলো এক এক করে পকেটে ফেলতে শুরু করলেন।"

একেবারে শেষ পয়সাটা পকেটে না রেখে দু আঙুলে ধরে কেমন যেন অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে রইলেন সেটার দিকে।

"বন্ধুগণ, মাল্টিভ্যাকই প্রথম কম্প্যুটার নয়, সর্বাধিক পরিচিতও নয়, এমনকি একজন উচ্চপদস্থ কর্মনির্বাহীর মাথার ওপর থেকে সিদ্ধান্তের বোঝা হাল্কা করার ক্ষমতাও এর নেই। বুঝলে জন, এটা ঠিকই যে একটা যন্ত্রই যুদ্ধটা জয় করেছে। অন্ততঃ একটা খুবই সোজা পদ্ধতি ছিল এই জয়ের মূলে। যখনই কোন জটিল সিদ্ধান্ত নিতে হ'ত, তখনই আমি এই পদ্ধতির আশ্রয় নিতাম এইভাবে।"

বলেই একটা হাল্কা হাসি হেসে তিনি হাতের পয়সাটাকে বুড়ো আঙুলের টোকায় শূন্যে পাঠিয়ে দিলেন। হাওয়ায় একটা ডিগবাজি খেয়ে চকচকে পয়সাটা সুইফটের বাড়ানো হাতের তেলোয় নেমে এল। বাঁ হাত দিয়ে পয়সাটা চাপা দিয়ে জোড়া হাতটা এগিয়ে দিলেন ওদের দুজনের সামনে।

"বল দেখি বন্ধুরা, 'হেড' না 'টেল'?"—সুইফটের প্রশ্নটা দুটি হতভম্ব মুখের উপর দিয়ে ঘুরে এল। দুজনের মুখেই হয়তো একটাই প্রশ্ন: সত্যিই কি এই সহজ পদ্ধতিতে যুদ্ধ জয়, সম্ভব হয়েছিল?

খুদে বৈজ্ঞানিক
দিলীপ দাস
ট্রিং
এঃ, এটা কি ঝুলছে এখানে!
দেখি তো টেনে!
ইয়াং!
ধুপ!
অঁক!
উজবুকস্বগাঁহেবগ, তুই গাছের ওপর দড়ি ফেলে কি করছিলি?
উফফ্! দেখছিস না ফিতে দিয়ে গাছটার হাইটটা মাপছিলুম? আর একটু হলেই তো দফারফা করে দিয়েছিলি!
গর্দভ! এর জন্যে তোকে গাছে উঠতে কে বলেছে! মাউন্ট এভারেস্ট মাপতে বললে তো তুই ফিতে নিয়ে পাহাড়ে উঠবি, তাই না?
নাঃ, হ্যাঁ!
না। নীচ থেকেই যে কোন জিনিসের উচ্চতা মাপা যায় এবং এর জন্যে অংক আছে।
এটা জেনে রাখ, মাউন্ট এভারেস্ট জয়ের বহু আগেই রাধানাথ শিকদার নামে এক বাঙালী বৈজ্ঞানিক এর সঠিক উচ্চতা পরিমাপ করেছিলেন। অবশ্য তোর মতো ফিতে নিয়ে তাঁকে পাহাড়ে চড়তে হয়নি। স্রেফ অংক কষে।

যাক গে, তুই বরং ডগাকে মাপ। এর জন্য তোকে কোথাও উঠতেও হবে না আর অংকও কষতে হবে না।
আবার আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন?
আমি এদিকে ধরছি—এবার বল কত হল। আঃ, মাপতেও জানিস না! জন্তু-জানোয়ার মাপার নিয়ম হল হেড টু টেল। সুতরাং এর লেজের ডগা অবধি কতটা তাই বল।
বুঝেছি। দু-ফুট পাঁচ ইঞ্চি।
এবার তের আর আমার হাইটটা মেপে দেখি আয়।
দ্যাখ একটা মানুষের দৈর্ঘ্য প্রস্থই সব নয়।
কেন! একজনের সম্বন্ধে বলতে গেলে তো আমরা ঐ দৈর্ঘ্য প্রস্থই ব্যবহার করি।
তা ঠিক, তবে টোটাল পরিমাপ করতে গেলে যে যে উপাদান দিয়ে একজন মানুষ তৈরী হয়েছে তার হিসেবটাও জানা দরকার।
যেমন জল গ্যাস চুন লোহা চিনি কার্বন ফসফরাস ইত্যাদি। এ সব তো তোর ঐ গজ-ফুট-ইঞ্চিতে আসবে না।
হ্যাঁরে আমি যে তখন পরে গেসলুম তাতে কি তোর মাথায় কোথাও খুব লেগেছে? লাগলে বল. এখুনি তোকে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাওয়া দরকার।
ডাক্তারখানা-কেন?
তুই যে বেটে ভুলভাল বকছিস, তাতে আশংকা হচ্ছে তোর মাথাটা হয়তো বিগড়ে গেছে।
তুই একটি আস্ত মুখ্যু!

মুর্খের মতো কথা কিন্তু তুইই বলছিস! এইসব মালমশলা নিয়ে কোন মানুষ বেঁচে থাকতে পারে? না বেঁচে থাকা সম্ভব?
ওফস্, তোকে কি করে বোঝাবো যে এইসব মালমশলা দিয়েই এ দেহ তৈরী।
খুদে, আমরা ভেজাল খাই, ভেজালের যুগে বাস করছি ঠিক কথা। কিন্তু তুই যা ভেজালে দিতে শুরু করেছিস, পুলিশ জানতে পারলে তোকে খাঁচাতে পাঠিয়ে দেবে!
AUG·87
কি মুসকিল! এগুলো ভেজাল নয়। এগুলো দেহের একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান! এর একটি কম থাকলে দেহে রোগ দেখা দিতে পারে এমন কি মৃত্যুও হতে পারে।
বুঝেছি। খুদে তুই এক মিনিট এখানে দাঁড়া, আমি যাবো আর আসবো।
তার মানে আশে-পাশে কোথাও ঝালমুড়ির সন্ধান পেয়েছিস বুঝি? ঠিক আছে যা।
তুই কোত্থাও যাবি না। ঝালমুড়ি নিয়ে আমি এখুনি আসছি।
এই সুযোগে মেজকাকে ডেকে নিয়ে যাই, খুদের রোগটা মেজকাই বুঝতে পারবে। এমন ভুলভাল বকা কি সুস্থ লোকের পক্ষে সম্ভব!
আরে, পটলা যে। এখানে হঠাৎ কি মনে করে?
মেজকা খু-খুদে কেমন যেন করছে!
খুদে কেমন করছে! মানে এ্যাকসিডেন্ট দুর্ঘটনা—ওর কি হয়েছে? ও কোথায়?
তু-তুমি চল। আমি ওকে ধরে রেখেছি।

আরে পটলার হাতে ঝালঘুড়ি কই। সঙ্গে মেজকা কেন?
হ্যাঁরে খুদে, তোর কোথায় কি হয়েছে? কোথায় লেগেছে?
লেগেছে! কার? আমার? কোথায়?
মাথায়!
বুঝেছি। মানুষের দেহ কি কি পদার্থ দিয়ে তৈরী তার একটা নাতি বিস্তৃত লিস্ট্ ওকে শোনাচ্ছিলুম, তাইতে ও ঘাবড়ে গিয়ে তোমাকে ডেকে এনেছে।
হাঃ-হাঃ-হাঃ, হিঃ-হিঃ-হিঃ!
শোন পটলা, ওর বলার মধ্যে কিছু টেকনিক্যাল ভুল থাকায় কথাটা ঠিক ধরতে পারিস নি। তাই তুই ধোঁকা খেয়ে গেছিস। নতুবা অল্ কারেক্ট।
ঐ চুন চিনি লোহা ফসফরাস্ কার্বন ইত্যাদি মানব দেহে বেশ পরিমাণ মতই আছে তবে ওগুলো মাংস রক্ত মজ্জার মধ্যে সংপৃক্ত হয়ে দেহ গঠনে সাহায্য করে যাচ্ছে। বিশেষ পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করলে এর অস্তিত্ব দেখতে পাবি।
এই সব পদার্থ, আমরা যা খাই তার থেকেই পাই। সুতরাং ভয়ের কোন কারণ নেই।
হিক্!
কি, মাথায় কিছু ঢুকলো? তোর ঐ গড় ফুট ইঞ্চি দিয়ে এর থই পাবি না।
কি কাণ্ড! এরা তো আমাকে সত্যই অথৈ জলে ফেলে দিয়ে গেল!

ধরণের উর্বর মাটি পাওয়া যায়—যার নাম ডায়াটম মাটি। এই ডায়াটম আবার সৃষ্টি হয়েছে বহু যুগ ধরে জমে থাকা অ্যালগীর দেহ থেকেই।

আজকাল ডায়াটম মাটি বা 'ডায়াটমেসিয়াস্ আর্থ' নানা কাজে ব্যবহার করা হয়—বিশেষ করে শিল্পক্ষেত্রে। এই মাটির বৈশিষ্ট্য হল যে এটি অগ্নিরোধক এবং এই মাটির অদ্ভুত শোষণ ক্ষমতা আছে। চিনির কারখানায় এবং তেলের মিলে এই মাটির তৈরি ফিলটারের খুব প্রচলন আছে। বয়লার এবং রেফ্রিজারেটারের ইনসুলেটার হিসেবেও এই মাটি ব্যবহার করা হয় অনেক দেশে। টুথ পাউডার, পালিশ ইত্যাদি তৈরিতেও অনেক সময় ডায়াটম মাটির প্রয়োজন হয়।

চিকিৎসার ক্ষেত্রেও অ্যালগীর অবদান অপরিসীম। অনেক সামুদ্রিক উদ্ভিদ (Sea weed) থেকে প্রচুর পরিমাণ আইয়োডিন লবণ পাওয়া যায়। এর মধ্যে অ্যালগীর সংখ্যাও কম নয়। শতকরা হিসাবে এই আইয়োডিন লবণের পরিমাণ ওতে খুব বেশি। ল্যামিনারিয়া জাপোনিকা আর কোডিয়াম ইনট্রিকেটাম-এর নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। কিছু কিছু অ্যালগী থেকে অ্যান্টিবায়োটিক্স্ও পাওয়া যায়। ওষুধের ক্ষেত্রে যার অবদান অনস্বীকার্য। যেমন ক্লোরেলা থেকে ক্লোরেলিন। জেলিডিয়াম থেকে যে আগর পাওয়া যায় তা দিয়ে তৈরি করা হয় 'ল্যাক্সেটিভ' অর্থাৎ কোষ্ঠকাঠিন্যের ওষুধ। তা ছাড়া অন্যান্য মলম এবং ওষুধের বড়িতেও এর প্রয়োজন আছে।

প্রাচীনকালে উনানী হাকিমরা অ্যালগীর সাহায্যে বহু কিডনি, ফুস্ফুস্ এবং ব্লাডারের অসুখের চিকিৎসা করতেন। কারাঘীন এক্সট্রাক্ট রক্ত জমাট বাঁধার কাজে এখনও ব্যবহার করা হয়। নরওয়ে ফ্রান্স, ডেনমার্ক এবং হল্যাণ্ডে জীবজন্তুর খাবার হিসাবে অ্যালগীর ব্যবহার প্রচলিত আছে।

কৃষির ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে কিছু নীল-সবুজ অ্যালগী—যেমন, অ্যানাবিনা, নস্টক, অস্সিলেটারিয়া ইত্যাদি মাটিকে অনেক উর্বর করে তোলে। মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে। বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা হয় নাইট্রোজেন ফিক্সেশন্। এর ফলে ফসলের চাষ সুন্দর হয়ে ওঠে। পরিমাণ এবং গুণ এই দুইয়েরই অদ্ভুত উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। কিছু কিছু অ্যালগী সার (ফার্টিলাইজার) হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। ভারতে টার্বিন্যারিয়া নামে এক অ্যালগী পাম গাছের সার হিসেবে খুব ব্যবহৃত হয়। রাজস্থানের সম্বর হ্রদ এলাকায় স্পাইরুলিনা এবং অ্যানাবিনা সবুজ সার হিসেবে ব্যবহার করা হয়, যাকে বলা হয় 'ম্যানিওর'।

পেট্রোল বা প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপত্তি হয়েছিল অ্যালগীর সাহায্যে এটি হল কোন কোন বিজ্ঞানীর মত। তাঁদের তেল এবং গ্যাস সৃষ্টি হয়েছে সামুদ্রিক পরিবেশে জৈব আবর্জনা থেকে—অবশ্য লক্ষ লক্ষ বছর লেগেছে এই

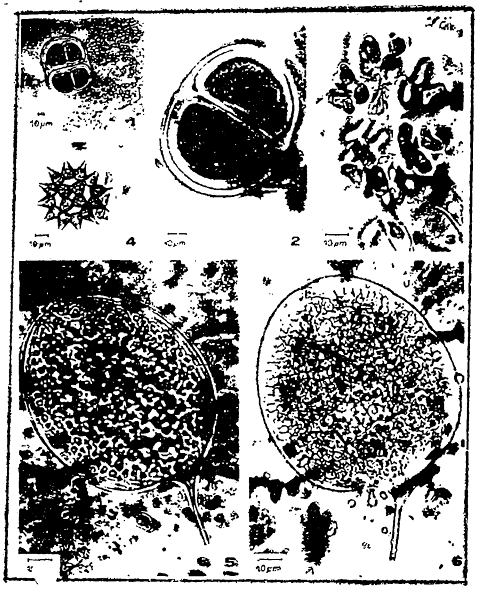

নানা ধরনের অ্যালগী

পরিবর্তনের জন্য।

সবুজ অ্যালগী—যেমন, ইউগ্লিনা, ক্লোরেলা ইত্যাদি বিষাক্ত পয়ঃপ্রণালীর ময়লা জলকে—যাকে ইংরেজীতে বলে সিউ-এজ ওয়াটার—সারে পরিণত করতে পারে।

পৃথিবীর অনেক অংশে প্রকাণ্ড আয়তন জুড়ে চুণা পাথরের স্তূপ দেখা যায়। এইসব এলাকাকে বলা হয় লাইমস্টোন টপোগ্রাফি। এই লাইমস্টোন সৃষ্টির পিছনেও রয়েছে অ্যালগীর বেশ কিছুটা হাত। অবশ্য অন্য অনেক সামুদ্রিক প্রাণীরও হাত আছে এতে।

আজকের এই মহাকাশ যুগেও অ্যালগীর মূল্যবান্ অবদান রয়েছে। ক্লোরেলা নামে এক ক্ষুদে সবুজ অ্যালগীর কথা আগেই বলেছি। মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে এখন এটা একটা আলোচনার বস্তু হয়ে উঠেছে। অনেক পরীক্ষা এবং গবেষণা করে দেখা গেছে যে ক্লোরেলা যদি মহাকাশ-চারীর সঙ্গী হয়ে মহাকাশযানে যাত্রা করে তাহলে নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসা কার্বন ডাই অক্সাইড টেনে নিয়ে এত অক্সিজেন ছেড়ে দিতে পারে যে দেখতে দেখতে সমস্ত পরিবেশই আবার অক্সিজেনে ভরপুর হয়ে ওঠে। দূষিত বাতাস ফের টাটকা বাতাসে পরিণত হয়।

যাই হোক মোটামুটি দেখা যাচ্ছে যে অ্যালগী সামান্য আকারের উদ্ভিদ হলেও তার উপকারিতা সামান্য নয়। যুগ যুগান্তর ধরে অ্যালগীর যে অসামান্য ভূমিকা রয়েছে তা আমরা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না।

C/o ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য, 16 টাউনসেণ্ড রোড, কলকাতা-26

মানুষের জন্য বিজ্ঞান 16 টাকা
বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র 28 টাকা

তপন কুমার চক্রবর্তী ॥ মুক্তধারা ফরাসগঞ্জ. ঢাকা, বাংলাদেশ।

মানুষের জন্য বিজ্ঞান-বইখানি 13টি প্রবন্ধের সঙ্কলন। প্রবন্ধগুলি যথাক্রমে মানুষের জন্য বিজ্ঞান, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা ও পরিভাষা সমস্যা, প্রকৃতি ও বংশগতি নিয়ন্ত্রণে বিজ্ঞানের ভূমিকা, হৃদরোগ প্রশমন প্রসঙ্গে, অন্য গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব কি সম্ভব, লেসার ও মানুষের ভবিষ্যৎ, বিজ্ঞানে সাম্প্রদায়িকতা, সর্ষের ভূত ও লাল গ্রহে ভাইকিং প্রভৃতি।

লেখকের প্রতিটি প্রবন্ধই সময়োপযোগী এবং সুলিখিত। লেখক যে শক্তিমান তা তাঁর লেখার প্রতিটি ছত্রেই প্রমাণ করেছেন। অধিকাংশ প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি আমাদের প্রচলিত কুসংস্কারগুলিকে জয় করার আহ্বান জানিয়েছেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও সাম্প্রদায়িকতার মত হলে মনোভাব ও গোঁড়ামিকে বর্তমানে বিজ্ঞানের এমন উন্নতির দিনেও মানুষ প্রশ্রয় দিয়ে "অমানবীয় মনোভাবের" পরিচয় প্রদান করছে তাতে লেখক মর্মাহত। প্রকৃত বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে ওঠার জন্য এবং "সংস্কারের অচলায়তনকে" ভেঙ্গে ফেলার জন্য বহু যুক্তিরও অবতারণা করেছেন। ডারউইন ও সেদিনের ইউরোপের পরিস্থিতির উল্লেখের মাধ্যমে আমাদেরও জানিয়েছেন ধর্ম সম্বন্ধে উদার হতে। সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা সংক্ষিপ্ত হলেও সত্যেন্দ্রনাথের জীবনের কতকগুলো টুকরো টুকরো কাহিনীর মাধ্যমে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন।

বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বইখানিও সুখপাঠ্য। পুস্তকটি পাঠ করে কেবল কিশোরেরা উপকৃত হবে না বড়রাও বহু তথ্য অবগত হতে পারবেন। জীবনী অংশটির জন্য মনে হয় ন্যাশন্যাল বুক ট্রাস্ট-নিউদিল্লী থেকে প্রকাশিত এস এন. বাসু রচিত "জগদীশচন্দ্র বোস" নামক ইংরাজী বইটি থেকে কিছু তথ্য গ্রহণ করেছেন। স্বল্প আয়তনে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা।

সুধাংশু পাত্র

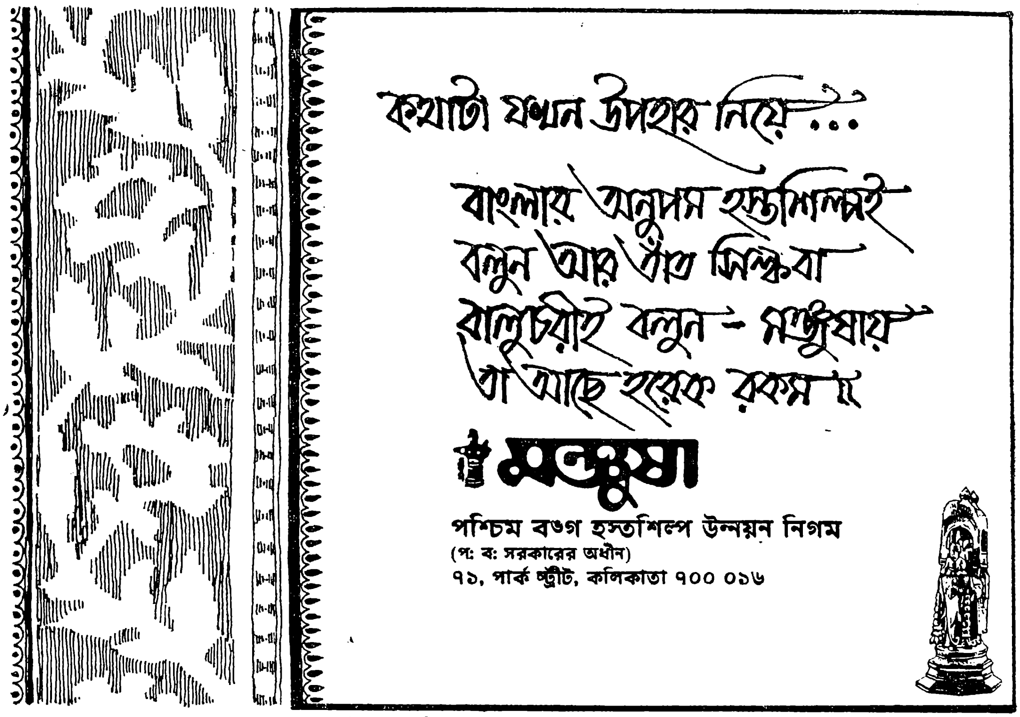

মঞ্জুষা শো রুম ঃ লিন্ডসে স্ট্রীট, লেক মার্কেট, ঢাকুরিয়া সি-আই-টি মার্কেট, হাওড়া সাবওয়ে, দমদম এয়ারপোর্ট, বারুইপুর, সিউরি, বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, বোলপুর, হলদিয়া, দার্জিলিঙ, বনগাঁ, রায়গঞ্জ, মালদা, দিল্লী, মাদ্রাজ, বাঙগালোর, জয়পুর, বালুরঘাট, শিলিগুড়ি ও পুরী

DIOR 4186

পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত

দিবাকর সেন

কলকাতার খুব কাছেই বৈদ্যবাটী গ্রাম। হাওড়া স্টেশন থেকে লোকাল ট্রেনে এক ঘণ্টারও দূরত্ব নয়। এই গ্রমেই ইং 1800 সালে পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্তের জন্ম হয়। পিতার নাম বলরাম গুপ্ত। শিশু বয়সে মধুসূদন পড়াশুনোয় খুব অমনোযোগী ছিলেন। ফলে একটু বড় হতে তিনি তাঁর পিতার বিরাগভাজন হ'ন। তিনি গৃহত্যাগ করেন। চলে আসেন কলকাতা শহরে। এরপর তাঁর জীবনে দ্রুত পরিবর্তন আসে। তিনি নিজে গিয়ে ভর্তি হন সংস্কৃত কলেজে। পড়াশুনো শুরুর অল্পকালের মধ্যেই মধুসূদন কৃতী ছাত্র হিসেবে চিহ্নিত হন। সংস্কৃত কলেজে তখন সুশ্রুত, চরক, ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি সনাতন চিকিৎসা শাস্ত্র পড়ান হ'ত। 1826 সাল থেকে ডাঃ ঘাইটলার প্রতীচ্য চিকিৎসা পদ্ধতি বিষয়ে ছাত্রদের উপদেশ দিতে শুরু করেন।

1830 সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে বৈদ্যক শাস্ত্রের শিক্ষক ক্ষুদিরাম বিশারদ চলে যান। কলেজ কর্তৃপক্ষ মাসিক 60 টাকা বেতনে মধুসূদনকে সেই পদে নিযুক্ত করেন। সে সময় আমাদের দেশে এলোপ্যাথিক চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা ছিল না বললেই চলে।

1822 সালে কলকাতা শহরে নেটিভ মেডিক্যাল ইন্‌সটিটিশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছিল। তাতে 20 জন ছাত্র মাসিক 8 টাকা ছাত্রবৃত্তি পেয়ে হিন্দিভাষায় কিছু কিছু পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা শিখত। অধিকাংশ ছাত্রই ছিল উত্তরপশ্চিম প্রদেশবাসী ফৌজী সিপাহীদের পুত্র বা আত্মীয়-1833 সালে তদানীন্তন ভারতের গভর্নর জেনারেল ইউলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ব্যাপারটি ক্ষতিয়ে দেখার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটির সুপারিশ অনুসারে 1835 সালের 1লা জুন তারিখে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজে যাঁরা প্রথম শিক্ষকতা শুরু করেন পণ্ডিত মধুসূদন তাঁদের অন্যতম। *1839 সালে মেডিক্যাল কলেজে হিন্দিভাষায় সংক্ষিপ্ত এলোপ্যাথিক পাঠ্যক্রম চালু হয়। এই বিভাগের অধ্যক্ষ* ছিলেন মধুসূদন। 1845 সাল থেকে বাংলাভাষায়ও পঠন-পাঠন শুরু হয়। 1852 সাল থেকে মধুসূদন এই বিভাগের সুপারিণ্টেডেণ্ট পদে নিযুক্ত হন। এসময়ে মাতৃভাষায় চিকিৎসা বিজ্ঞান আয়ত্ত করার সুবিধের জন্য তিনি বাংলা-ভাষায় বেশ কয়েকটি চিকিৎসা সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেন। এই সব গ্রন্থের মধ্যে 1849 সালে প্রকাশিত "লণ্ডন ফার্মো-কোপিয়া" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া তিনি ছাত্রদের সুবিধের জন্য হুপার সাহেবের Anatomist Vedmecum গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে পণ্ডিত মধুসূদনের এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। এরজন্য তিনি এক বার পুরস্কৃতও হয়েছিলেন। তবে যে কারণের জন্য তিনি আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তা হল শবব্যবচ্ছেদ। কারণ তখন আমাদের দেশে শবব্যবচ্ছেদ সম্পর্কে অন্ধ কুসংস্কার ছিল। ভয় ছিল সমাজ-চ্যুতির। তাই ছাত্ররা মানুষের মৃতদেহের বদলে ছাগল কুকুর কেটে শারীরবিদ্যা বা এনাটমি শিখত। কিন্তু এ ব্যবস্থা চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের কাছে অসম্পূর্ণ ছিল। তাই বারবার দাবী তুলেছিলেন সমাজের শিক্ষিত মানুষরা। তারা বলেছিলেন সম্পূর্ণ চিকিৎসা বিজ্ঞান আয়ত্ত করতে গেলে শব ব্যবচ্ছেদ করতেই হবে। ডেভিড হেয়ার একবার পণ্ডিত মধুসূদনকে ডেকে বলেছিলেন, "তুমি কি শবদেহ ব্যবচ্ছেদের সমর্থনে কোনও উক্তি তোমাদের শাস্ত্রে পাইয়াছ ?"

অবশেষে সমস্ত বাধা কাটিয়ে মধুসূদন শবব্যবচ্ছেদ করলেন। জয় করায়ত্ত হয়। ভেঙ্গে গেল সমাজের অন্ধ কুসংস্কার। তারিখটি ছিল 28শে অক্টোবর 1836। তবে তারিখটি নিয়ে নানা বিতর্ক রয়েছে। সে যুগের নানা দায়িত্বশীল মানুষ সঠিক তারিখটি নিয়ে সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। আবার অনেকে বলেছেন শবব্যবচ্ছেদ মধুসূদন একা করেন নি। সঙ্গে ছিলেন কলেজের প্রথম ছাত্রদের মধ্যে রাজকৃষ্ণ দে দ্বারকানাথ গুপ্ত (মধুসূদনের পুত্র), উমাচরণ শেঠ ও নবীনচন্দ্র মিত্র।

বিতর্ক যাই হোক না কেন আধুনিক ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

বোস ইনস্টিটিউট, কলকাতা-9

তেরো ঃ নতুন জীবন

ছটফটিয়ে কাটালাম সারারাত। ভোর রাতেই উঠে পড়লাম বিছানা ছেড়ে। একমাস হয়ে গেল, সভ্য পরিবেশে আছি। কিন্তু মানিয়ে নিতে পারছি না কিছুতেই। রোজই সকালে উঠে চোখ কচলাই। মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করি খাঁচার জীবন।

অথচ কিছুর অভাব রাখেনি এরা। সবচেয়ে আরামে থাকার জায়গা দিয়েছে ; আলাদা শোবার ঘর, বাথরুম, জামাকাপড়, বই, টেলিভিশন সেট। খুবই উদারহস্ত বলতে হবে নরবানরদের। খবরের কাগজ পাই রোজ। যেতে পারি যেখানে খুশি, হাঁটতে পারি রাস্তায়, ফুর্তি করতে পারি যে কোনো প্রমোদকেন্দ্রে। প্রথম কয়েক দিনের মত উত্তেজনা আর আবেগ সৃষ্টি করি না বটে, কিন্তু যেখানেই যাই না কেন—নরবানররা খুশি হয় আমাকে দেখে।

কর্নেলিয়াসই এখন এই সংস্থার ডিরেক্টর। জেয়াসকে বদলি করা হয়েছে অন্য পদে। জিরা হয়েছে নতুন ডিরেক্টরের সহকারী।

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এখন আর আমি নিছক গিনিপিগ নই—সঙ্গী হিসেবে অংশ নিই গবেষণায়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হতে বাধ্য হয়েছে গ্র্যাণ্ড কাউন্সিল। কর্নেলিয়াসের চাপে।

বিছানা ছেড়ে উঠে চটপট জামাকাপড় পরে নিলাম। হেঁটেই চলে গেলাম খাঁচাঘরের দিকে—সেই খাঁচাঘর যেখানে একমাস আগেও বন্দী থাকতে হয়েছে আমাকে। কর্নেলিয়াসের অনুমতি নিয়ে মুক্তি পাওয়ার পর থেকে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি মানুষদের বোধোদয় ঘটানোর।

জিরা এখনও এই বিভাগের খবরদারি করে। আজকে কর্নেলিয়াসও এসেছে ওর সঙ্গে। কি যেন বলতে চায় আমাকে। তার আগে পশুবৎ মানুষগুলোকে কথা বলানোর চেষ্টা করলাম। এ চেষ্টা এক মাস ধরে করে আসছি। দুটো কি তিনটের বেশি শব্দ কেউ বলতে পারে না। তার পরেই যেন বেদম কাহিল হয়ে শুয়ে পড়ে খড়ের বিছানায়। তবে চোখে চমক দেখেছি, বুদ্ধির ক্ষণিক দীপ্তি দেখেছি। চেষ্টা চালিয়ে গেলে হয়ত এদেরকে আমার মতই মানুষ করে তোলা যাবে।

নোভা এখন একা থাকে খাঁচায়। আমি এলেই ফুর্তিতে দাঁত খিঁচোয়! সেদিনও তাই করছে, আমার শেখানো বুলি কপচাচ্ছে, এমন সময়ে কর্নেলিয়াস বললে—ইউলিসি, মেরু অঞ্চলে যাবে?

"কেন?"

"একজন ওরাংওটাং মাটি খুঁড়ে অদ্ভুত আবিষ্কার করেছে। তুমি থাকলে আরও অনেক কিছু জানা যাবে। গভর্নমেণ্ট আমাকে পাঠাচ্ছে। যাবে তুমি?"

"যাব", বললাম আমি। মনে মনে কিন্তু ভাবছি প্রফেসর অ্যান্টেলের কথা। ভদ্রলোককে এখনো খালাস করতে পারেনি কর্নেলিয়াস। কারণ এখনও তিনি পশুর মতই।

(২) দশ হাজার বছর আগের প্রহেলিকা

রওনা হলাম এক সপ্তাহ পরে। জিরাও সঙ্গে এল। তবে দিন কয়েক পরেই ওকে ফিরে যেতে হবে। কর্নে-

লিয়াস নেই বলেই ইনস্টিটিউটের দেখাশোনার ভার ওর ওপর।

কর্নেলিয়াস খোঁড়াখুঁড়ির জায়গায় থাকবে দীর্ঘদিন। যদি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

বিশেষ বিমানের ব্যবস্থা করা হয়েছে আমাদের জন্যে। জেটপ্লেন। পৃথিবীতে এ ধরনের বিমানের প্রথম মডেল যে রকম হয়েছিল, প্রায় তাই বলা যায়। তবে বেশ আরামপ্রদ। আমরা যে খুপরিতে রয়েছি, সেটা শব্দ নিরোধক। ফলে, আশমিটিয়ে গল্পগুজব করা যায়। উড়ন্ত বিমানে জিরার সঙ্গে বসে আছি একই কামরায়। ভাবছি, চলেছি কোথায় এবং কি দেখব সেখানে। নরবানরদের দুনিয়ার অনেক কিছুই দেখেছি এই এক মাসে—গা সওয়া হয়ে গেছে বলেই একজন নরবানর জেটপ্লেন চালাচ্ছে দেখে অবাক হইনি। অভিযানের কথা ভাবতে ভাবতে বেটেলগজ সূর্যের উদিত হওয়ার দৃশ্য উপভোগ করছি দুচোখ ভরে। উড়ে চলেছি প্রায় তিরিশ হাজার ফুট ওপর দিয়ে। আকাশ আশ্চর্যভাবে নির্মল। সুবৃহৎ নক্ষত্রকে দেখা যাচ্ছে দূর দিগন্তে—টেলিস্কোপের মধ্যে দিয়ে আমাদের সূর্যকে দেখা যায় যেভাবে—সেই ভাবে। দৃশ্যটা পুলকিত করে তুলেছে জিরাকে।

"ইউলিসি, পৃথিবীতে হয় এমন অপূর্ব সূর্যোদয়? সেখানকার সূর্য কি এখানকার সূর্যের মত এত সুন্দর?" মুগ্ধ চোখে দিগন্ত পানে তাকিয়ে প্রশ্ন করে জিরা।

বুঝিয়ে দিলাম আমাদের সূর্যের চেহারা কিরকম। এত বড় নয় ঠিকই, এত লালও নয়—তবে মুগ্ধ করে দেওয়ার মত তো বটেই। কিন্তু আমাদের চাঁদ সোরোর গ্রহের চাঁদের চেয়ে অনেক বড়, আলোর ধারাও অনেক মিঠে অথচ অনেক তীব্র।

ছুটি কাটাতে বেরিয়েছি যেন দুই বন্ধু, এমনি ভাবে ঠাট্টা-তামাসা করে চলেছি সমানে, এমন সময়ে চিন্তায় অন্ধকার মুখ নিয়ে পাশে এসে বসল কর্নেলিয়াস। কিছুক্ষণ ধরেই ওকে বড় নার্ভাস দেখছি। খাটে প্রচণ্ড। গবেষণায় ডুবে থাকে দিবারাত্র। তাই মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে থাকে অদ্ভুত ভাবে। যেন অন্য জগতে বিচরণ করে তখন। এই মুহূর্তে নিশ্চয় ভাবছে অভিযান-প্রসঙ্গ নিয়ে। বিষয়টা এখনও গোপন রেখেছে আমার কাছে। জিরাকেও মন খুলে কিছু বলেনি। আমি জানি খুব সামান্যই। নরবানরদের আদি উৎস আবিষ্কার নিয়েই এই অভিযান। এতদিন ধরে যা শেখানো হয়েছে, সনাতনী সেই তত্ত্ব মানতে রাজি নয় কর্নেলিয়াস। আজ সকালেই সামান্য কথা বলেছে বিষয়টা সম্পর্কে। আমার মত সভ্য মানুষের উপস্থিতি কেন এত দরকার, তাও বলেছে। হাজার বার যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি দুজনে, কথা শুরু হয়েছিল সেই প্রসঙ্গ নিয়েই।

ইউলিসি. তোমার মুখেই তো শুনেছি, পৃথিবী গ্রহে বাঁদররা পশু ছাড়া কিছুই নয়। মানুষ মগজ খাটিয়ে নাকি আমাদেরকেও ছাড়িয়ে গেছে। না, না, রাগ করছি না। বিজ্ঞান নিয়ে ভাবতে গেলে, বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলে রাগ করা চলে না।

তাতো বটেই। অনেক দিক দিয়েই পৃথিবীর মানুষ তোমাদের চাইতে উন্নত না হলে আমি এখানে এলাম কি করে?

ঠিক কথা। কয়েক শতাব্দী আগে তোমরা যা শিখেছ, আমরা এখন তাই আবিষ্কার করে চলেছি। কিন্তু—ছোট্ট কামরার এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্ত পর্যন্ত নার্ভাসভাবে পায়-চারি করতে করতে বলে যায় কর্নেলিনাস কিছুদিন ধরেই আমি ভাবছি, আমাদের বর্তমানের বহু রহস্যের চাবিকাঠি রয়েছে আমাদেরই সুদূর অতীতে। সবই যেন ছিল এ গ্রহেও অনেক আগে।"

ইচ্ছে হল বলি, অতীতকে নতুন করে আবিষ্কারের প্রচেষ্টা চলছে তো পৃথিবীতেও। বহু রহস্যের সমাধান ঘটছে পুনরাবিষ্কারের ফলে। এমনও হতে পারে, ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সর্বত্র চলছে এই একই কাণ্ড। ঈশ্বরের বিধান হয়ত তাই। আবিষ্কারগুলো হারিয়ে যাচ্ছে ভবিষ্যতের গর্ভে—পুনরাবিষ্কার বহু শতাব্দী পরে।

কিন্তু কথাবলিনি, বাধা দিই নি কর্নেলিয়াসকে। বেশ বুঝলাম, বিশেষ একটা ভাবনা ভাবতে ভাবতে মাথা গুলিয়ে ফেলেছে বেচারা। ধাঁধায় পড়ে মুখ খুলতে চাইছে আমার কাছে।

বললে বাধ-বাধ গলায়—হয়ত অন্য ধরনের মগজ ছিল এই গ্রহেই একসময়ে। হয়ত এখন আর নেই—

এই পর্যন্ত বলেই থেমে গেল অকস্মাৎ। যেন একটা মহা সত্যকে মন মেনে নিতে চাইছে না কিছুতেই মনের সঙ্গে লড়ে ক্লান্তও হয়ে পড়েছে। উপলব্ধ সত্যকে প্রকাশ করতে পারছে না মুখ ফুটে।

কিছুক্ষণ পরে বললে নিজে থেকেই—"ইউলিসি, তোমার মুখেই শুনেছি, পৃথিবী গ্রহের বাঁদররা নাকি অনুকরণ করতে দারুণ পোক্ত?"

"তা তো বটেই। অনুকরণটাই ওদের সবচেয়ে উন্নত অনুভূতি। কিছু মাত্র না ভেবেই অনুকরণ করে বসে যা দেখে, যা শোনে—সবকিছুই।"

"জিরা", চিন্তাচ্ছন্ন স্বর কর্নেলিয়াসের—"আমরাও কি অনুকরণে পোক্ত নই?"

আপত্তি করতে গেছিল জিরা, কিন্তু সে সুযোগ না দিয়েই ফের বললে কর্নেলিয়াস—"শৈশব থেকেই শুরু হয় অনুকরণ করার চেষ্টা। এটা আমাদের একটা প্রবৃত্তি। সহজাত অনুভূতি। আমাদের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষাই নির্ভর করছে অনুকরণ প্রবৃত্তির ওপর।"

এবার ফুঁসে ওঠে জিরা—"ও কাজটা করায় ওরাংওটাংরাই—জানি, জানি। ওদেরই লেখা বই পড়িয়ে আমাদের শিক্ষিত করে তোলে শৈশব থেকে। যা কিছু শিখিয়ে গেছে ওদের পূর্বপুরুষরা, ভুলশুদ্ধ সেইগুলোকেই জোর করে বারবার আমাদের বলতে বাধ্য করে এই ওরাংওটাং-রাই। অগ্রগতি এত মন্থর সেই কারণেই। গত দুহাজার বছরে একটুও এগোতে পারিনি যা ছিলাম, তাই আছি।"

নরবানরদের এই মন্থর অগ্রগতি সম্পর্কে কিছু মন্তব্য প্রয়োজন এখানে। খটকা লেগেছিল এদের ইতিহাস পড়বার সময়ে। মানুষের মন যেমন অবাধে উড়ে গেছে, এদের মন সেভাবে ধেয়ে যেতে পারেনি। বিশেষ এই পার্থক্যটা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাপারটা বেশ হেঁয়ালির মতই ঠেকেছিল আমার কাছে। এরকম অবস্থা পৃথিবীর মানুষের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে—ধাপে ধাপে সভ্যতা উঠতে উঠতে বেশ কিছু সময়ের জন্যে হোঁচট খেয়ে পড়েছে—মুখ থুবড়ে পড়েই থেকেছে। ওরাংওটাংদের সনাতনী শিক্ষাকে আঁকড়ে

ধরে যুগ যুগ ধরে বসে থেকেছে আমাদের বৈজ্ঞানিকরাও, ভুল শিক্ষা শিখে এসেছে এদেরই ভ্রান্ত ধারণার ফলে. হাস্যকর পাঠক্রম পড়ানো হয়েছে স্কুলে কলেজে। বছরের পর বছর মানুষ কাটিয়েছে অজ্ঞানের তমসার মধ্যে।

নরবানরদের ক্ষেত্রে অবশ্য অত বছর লাগেনি। ক্রম বিবর্তনও পৃথিবীর মানুষদের মত শ্লথগতি হয় নি। সোরোর গ্রহের অন্ধকার যুগ মাত্র দশহাজার বছরের। অথচ তাই নিয়েই শিল্পাজীদের কতই না চিন্তা ভাবনা। দীর্ঘ এই দশ হাজার বছরে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রগতিই ঘটেনি—গত পঞ্চাশ বছরেই হঠাৎ লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়েছে সভ্যতা।

কিন্তু আমার মধ্যে নিরতিসীম কৌতূহল জাগ্রত করেছে ওদের প্রাচীনতম ইতিহাস, প্রাচীনতম কিংবদন্তী; প্রাচীনতম স্মৃতিকথা। সবকিছুর মধ্যেই রয়েছে একটাই কাহিনী। বহু হাজার বছর আগে নাকি অতিশয় উন্নত এক সভ্যতা ছিল সোরোর গ্রহে। এখনকার সভ্যতার সঙ্গে অনেক দিক দিয়ে মিল ছিল সেই সভ্যতার। এখন যে দক্ষতা, কীর্তিকলাপ নরবানরদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে দশহাজার বছর আগেও তা বিদ্যমান ছিল এই গ্রহে। অন্তত এখনকার সঙ্গে তুলনা করার মত। তারও আগে? নিবিড় তমসা—একেবারে অন্ধকার! মৌখিক বা লিখিত কোনো রীতিনীতির অস্তিত্ব নেই কোথাও—ক্ষীণতম সূত্রেরও সন্ধান পাওয়া যায় না।

সংক্ষেপে বলা যায়, দশ হাজার বছর আগে যেন অলৌকিকভাবে আবির্ভূত হয়েছিল নরবানরদের সভ্যতা। তারপরের দশহাজার বছরে তা মোটামুটি একরকমই থেকেছে —খুব একটা পাল্টায়নি—উন্নতির পথে যায়নি। সাধারণ নরবানরেরা এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। মনের গতি অন্যদিকে প্রবাহিত না হওয়াটাকে স্বাভাবিক ব্যাপার বলেই ধরে নিয়েছে। কিন্তু কর্নেলিয়াসের শানানো অনুভূতি-সচেতন মগজে বিষয়টা একটা প্রহেলিকার সৃষ্টি করেছে দীর্ঘদিন ধরে। ধাঁধার কিনারা করতে না পেরে যন্ত্রণায় ছটফট করেছে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত।

প্রতিবাদের সুরে বলেছিল জিরা—"মৌলিক সৃষ্টি করার মত নরবানরও আছে সোরোর গ্রহে।"

"আছে বইকি", সায় দিয়েছিল কর্নেলিয়াস—"বিশেষ করে সাম্প্রতিককালে তাদের সংখ্যা খুব কম নয়। সময় যত যাবে, মনও পাল্টাবে—বাইরে তার প্রকাশ ঘটবেই। প্রকৃতির নিয়মে ক্রমবিবর্তন ঘটে চলে এইভাবেই........কিন্তু আমি আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করছি, আদিতে আছে একটা বিরাট অজানা রহস্য.....দশ হাজার বছর আগে হঠাৎ যে সভ্যতার শুরু, তা নিশ্চয় আকাশ থেকে পড়েনি, মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসেনি—শুরুরও শুরু একটা আছে। সেই আদি শুরুর কাহিনী জানতেই আকুল হয়ে উঠেছে আমার প্রতিটি অণু পরমাণু—জিরা...জিরা... যদ্দিন তা না জানতে পারছি, স্বস্তি পাব না, শান্তি পাব না।"

"তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি।"

"না, জিরা, না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, রহস্যময় সেই আদি শুরুকেই দশ হাজার বছর ধরে স্রেফ অনুকরণ করে আসছি আমরা। অনুকরণ শুরু হয়েছিল দশ হাজার বছর আগে—কিন্তু কিসের অনুকরণ? কার অনুকরণ? জানতে আমাকে হবেই।"

"আমারও সেই প্রশ্ন, কর্নেলিয়াস। কাদের অনুকরণ করছি আমরা?"

চুপ মেরে গেছে কর্নেলিয়াস। যেন খুব বেশি বলা হয়ে গেছে, তাই বোবা থাকাই মনস্থ করেছে। মুখে অনুতাপের ছাপও দেখেছি। হাউ হাউ করে এত কথা যেন না বললেই হত।

মৃদুকণ্ঠে বলেছে অনেকক্ষণ পরে—"এক্ষুনি জবাব দিতে পারব না, জিরা। প্রমাণ ছাড়া জবাব দেব না। মরুভূমির নিচে যে শহরটা পাওয়া গেছে, যে শহর দেখতে চলেছি আমরা—প্রমাণ পেলেও পেতে পারি সেখানে। শহরটা নাকি তৈরি হয়েছিল দশ হাজার বছরেরও আগে—এমন এক যুগে, যে যুগের কোন খবর আমরা রাখি না।"

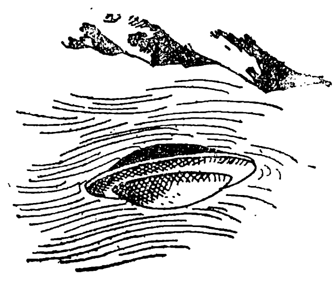

আলোক রহস্য

চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত

সন্ধ্যের অন্ধকারে মাঠের পর মাঠ ডিঙিয়ে বাড়ি ফিরছিল জেন, প্রিয়বন্ধু নিনার বাড়ি থেকে। জেনের বাড়িটা শহরাঞ্চলে নয়, শহর ছাড়িয়ে নিরিবিলি এক প্রকাণ্ড মাঠের একটা ছোট্টো কটেজে সে তার মা বাবা ও ভাইয়ের সঙ্গে থাকে। জেনের বাবা মিস্টার হেনরী ডেভিড একজন অবসর প্রাপ্ত জাঁদরেল পুলিস অফিসার—ভাই টিম স্থানীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র।

পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে জেন একটা গাছের তলায় বসে খানিক বিশ্রাম নিচ্ছিল। হঠাৎ আকাশের গায়ে ভেসে থাকা একটা আলোর গোলাকৃতি কি দেখে সে ভারী অবাক হয়ে গেলো। সেই অজানা আলোটা কিন্তু এক জায়গায় স্থির না থেকে এদিকে ওদিকে যাতায়াত করে বেড়াচ্ছিলো। জেনের হঠাৎ মনে হলো কে যেন তাকে খুব লক্ষ্য করছে। বেজায় ভয় পেয়ে তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ির দিকে ছুটতে শুরু করে দিলো। অন্ধকার মেঠো রাস্তায় হোঁচট খেতে খেতে বাড়ির বেড়ার কাছে পৌঁছে পেছন ফিরে সে দেখলো সেই আলোর বলটা একটা চ্যাপ্টা ধাতব কিছুর রূপ নিয়ে তাদের বাড়ির ঠিক পেছনের ঝোপে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেলো। বাড়িতে ঢুকে চিৎকার করে সে মা বাবা ও ভাইকে ডেকে বাইরে নিয়ে এলো; কিন্তু ঘোর অন্ধকারে কিছুই দেখা গেলো না—টিম তাকে ঠাট্টায় অস্থির করে তুললে সে বারংবার তাদেরকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করলো। বেচারী—কেউই তাকে আমল দিলো না—কারণ প্রত্যেকেই ভাবলো সে অন্ধকারে কাল্পনিক কিছু চিন্তা করেছে।

ইতিমধ্যে মিসেস ডেভিড অর্থাৎ টিম ও জেনের মা গ্যাসে বসানো অসমাপ্ত স্টু-টার পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি লক্ষ্য করলেন না যতবার তিনি পেছন ফিরছিলেন ততবারই কাঁচের জানলার ওপিঠ থেকে আলোর একটা মূর্তি তাঁকে লক্ষ্য করছে। একটু পরে স্টু-র পাত্রটা হাতে নিয়ে এদিক ফিরতেই তিনি বীভৎস চিৎকার করে উঠেই ঝন-ঝনিয়ে হাতের থেকে পাত্রটা ফেলে দিলেন। তাঁর চিৎকার শুনে মিঃ ডেভিড, জেন ও টিম তিনজনেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এলেন। ভয়ে পাংশু মুখে মিসেস ডেভিড স্বামীকে বললেন, "জানলার ওপিঠে আমি একটা আলোয় ঘেরা অদ্ভুত মুখ

দেখেছি—সেটা মানুষের নয়, তবে কী সেটা তাও আমি জানি না।" সঙ্গে সঙ্গে দুর্দম সাহসী মিঃ ডেভিড, পুত্র টিমও রাইফেল সঙ্গে নিয়ে তাঁর কটেজের চারদিকে টর্চ হাতে খুঁজতে বেরিয়ে পড়লেন। কটেজের বাঁদিকটায় মিঃ ডেভিড অনুসন্ধান করছিলেন আর টিম ছিলো ডানদিকে। অন্ধকারে টর্চ ফেলে ফেলে টিম একটু একটু করে বাড়ির পেছন দিকের ঝোপ, জেন যেখানে সেই ধাতুর যন্ত্রটাকে নামতে দেখেছিলো, সেদিকে এগোতে লাগলো। তার হাতে উদ্যত রাইফেল। মিঃ ডেভিড নানাদিকে টর্চের জোরালো আলো ফেলে চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে চলতে চলতে বাড়ির পেছনের ঝোপ ঢাকা পোড়ো জমিটার কাছে এসে দেখতে পেলেন, ঝোপের থেকে একটা আলোর বিন্দু ক্রমশঃ বড়ো হয়ে তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। আলোর মধ্যে আবছায়া আবছায়া ভাবে তিনি একটা মূর্তির মতো জিনিস দেখতে পেলেন। হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে রাইফেল বাগিয়ে চার পাঁচ বার সেদিকে ফায়ার করে দিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, গুলিগুলো আলোর বৃত্তটিতে গিয়ে মিলিয়ে গেলো। সামান্যতম আলোড়নেরও সৃষ্টি হলো না। গুলির শব্দে টিম তড়িঘড়ি করে ছুটে এলো—কিছুক্ষণ আলোর পর্দায় লুকিয়ে থাকা ভিনগ্রহী জীবটির দিকে তাকিয়ে মিঃ ডেভিড ও টিম দুজনেই বেজায় আতঙ্কে বাড়ির দিকে ছুটতে শুরু করে দিলেন। বাড়িতে পৌঁছে মিঃ ডেভিড কয়েক মুহূর্তেই সমস্ত আলো নিবিয়ে দিয়ে কটেজটা ঘুটঘুটে অন্ধকার করে দিলেন। বাড়ির প্রত্যেকটা মানুষই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে জেন হঠাৎ সংবিত ফিরে পেলো। পেছনের দিকের জানলার দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলো একটু ঠাণ্ডা হাওয়া পেতে। ওঃ! আবারও সেই আলোয় ঘেরা বীভৎস মুখটা জানলার ওপিঠে ভেসে উঠলো। জেন আতঙ্কে নীল হয়ে বাবাকে ডাকলে তিনি হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে জানলা লক্ষ্য করে গুলি চালালেন। ঝন্‌ঝন করে কাঁচগুলো খসে পড়লো। এক-পলক গরম বাতাস ঘরে ভেসে এলো—কিন্তু মুখটাও অদৃশ্য হয়ে গেলো। ঘরের অন্যদিকে জানলার বাইরে পাঁচ সেলের জোরালো টর্চ ফেলে ফেলে টিম কি জানি দেখছিলো। হঠাৎ ভীষণ উত্তেজিত ভাবে সে জানলার বাইরে আঙুল দিয়ে কি একটা দেখাতে শুরু করলো। উত্তেজনার ঠেলায় তার মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছিলো, জিজ্ঞেস করায় বেচারী বারবার জানলার বাইরেই আঙুল উঁচিয়ে দেখাতে থাকলো। অবাক হয়ে মিঃ ডেভিড, মিসেস ডেভিড আর জেন একসঙ্গে জানলার কাঁচের পাল্লার গায়ে ঝুঁকে পড়ে টিমের টর্চের আলোয় নির্দেশ করা জায়গায় দুটো অদ্ভুত চেহারার মূর্তিকে ধীরে ধীরে পিছু হটে অন্ধকার ঝোপের কাছে এগিয়ে যেতে দেখলো। মূর্তিদুটো খানিকটা মানুষের মতন, খানিকটা জন্তুর মতন। মানুষের মতো তদের দুটো করে হাত, পা রয়েছে। পুরো শরীরটা সাদা রঙের চক্‌চকে ধাতব চাদরে মোড়া। মাথাটা শঙ্কু আকৃতির, কানদুটো খরগোসের মতন খাড়া খাড়া আর

হাঁটার ভঙ্গীটা আদিম আমলের বনমানুষের মতো। তারা পিছু হটতে হটতে আস্তে আস্তে ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো। একটু পরেই সেই আগেকার চ্যাপ্টা গড়নের ধাতব যন্ত্রের মতো জিনিসটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে প্রচণ্ড বেগে আকাশের দিকে উঠে গেলো। ডেভিড পরিবারের চারজনের অবাক চারজোড়া চোখের সামনে দিয়ে যন্ত্রটা অবশেষে একটা ছোট্টো আলোর বিন্দু হয়ে আকাশে মিলিয়ে গেলো। হতবাক হয়ে থাকা মিঃ ডেভিড, মিসেস ডেভিড, টিম, জেন কেউই রহস্য-ভেদে সক্ষম হলো না। ওই অদ্ভুত মূর্তিদুটো কি? তারা কোথায় গেলো—যন্ত্রটারই বা কি হলো—কিছুই তাঁরা বুঝলেন না। শুধু হতভম্ব হয়ে পরস্পরের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে সারা সন্ধে ধরে ঘটে যাওয়া আজগুবি ঘটনাটাকে চিন্তা করে যেতে থাকলেন।

21/1 রসা রোড (সাউথ) থার্ড লেন। কলিকাতা-33

ছড়া

সূর্য ধরা কল

সুবোধ কুমার রায়

ছাদে বসে ভোম্বল কি জানি কি করছে,—
বলে সে যন্ত্র দিয়ে সূর্যকে ধরছে।
সূর্যকে একবার ধরেছিল হনুমান,
হয়ত এমনি ভাবে—করে দেখ অনুমান।
কোথা থেকে খান কয় আয়নাকে জুটিয়ে
সাজিয়ে কেমন করে দিল জল ফুটিয়ে।
আগুনের ভয় নেই, নেই কোন ঝঞ্ঝাট
ধোঁওয়া নেই, কালি নেই, কয়লা কি নেই কাঠ।
ভাত হবে, ডাল হবে, হতে পারে ছেঁচ্‌কি
শুধুই চাপাতে হবে কড়াই কি ডেক্‌চি।
আমিষ বা নিরামিষ যে যাহাই খান না
নিমিষে সহজে সব হয়ে যাবে রান্না।
স্যাঁকাও সহজ কাজ সোজা কাজ সিদ্ধ,
যন্ত্রে সবাই পারে শিশু থেকে বৃদ্ধ।
ঠাক্‌মা বললে হেসে বেশ কল দেখি এ
এই কলে বড়ি তবে নিতে পারি শুকিয়ে।
ভোম্বল বলে ঠামা আছে এক শর্ত
এ কলটা ধার নিলে চাই আমসত্ত্ব।

গঙ্গা সরকারী আবাসন, বহরমপুর।

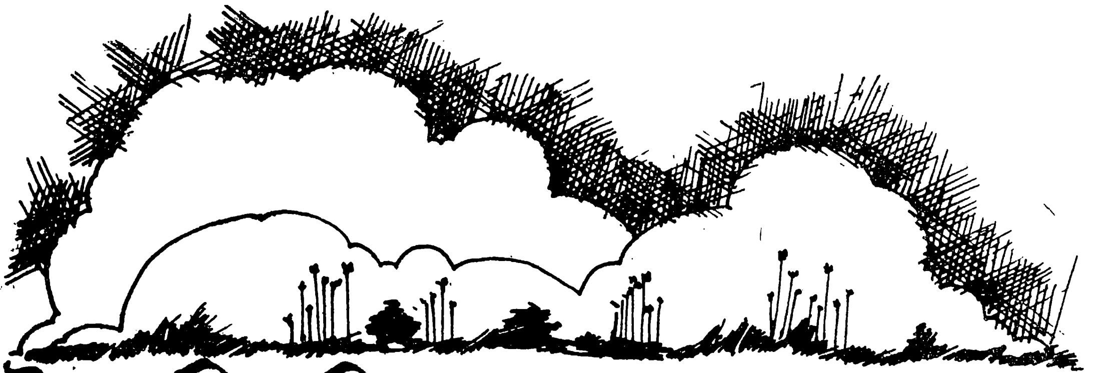

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে মেঘতত্ত্ব

শ্রী শচীনন্দন আঢ্য

মেঘ কি, কেন ও তার স্বভাব ধর্ম কি তার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় আকাশ বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি তৎপর হয়েছেন। আকাশ মার্গে লক্ষ্য করলেই নানা চরিত্রের মেঘ দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই মেঘ তথ্য সংগ্রহের সুযোগ বেশি। যে জন্য নাতিশীতোষ্ণ ভারত বর্ষের আকাশকে মেঘ তত্ত্ব বিকাশের উপযোগী বলে তাঁরা বিবেচনা করেছেন। কারণ এদেশে দ্বিমাসিক ঋতু পরিবর্তন থাকায় নাকি সে সুযোগটা বেশি কেননা ঘনঘন ঋতু পরিবর্তনের ফলে মেঘেরও রূপ পরিবর্তন হয় প্রায় সব ক্ষেত্রেই। যে জন্য তাঁদের অভিমত, মেঘ তথ্য নিয়ে গবেষণা ইউরোপে না হয়ে ভারতেই হওয়া উচিত কিন্তু ভারতের মানুষ স্বল্প প্রয়াসী বলে তা আজও সম্ভব হয়নি।

যাই হোক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বলে মেঘ সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার প্রকৃতির। (1) কিউ মিউ লিমবাস, (2) স্টেট্রো কিউ মিউলাস বা স্টেট্রাস, (3) অলট্রো কিউ মিউ লাস (4) অলট্রো স্টেটাস, (5) সিরোকিউ মিউলাস বা সিরো-স্টেটাস অথবা সিরাস।

কিউ মিউ লিমবাস অর্থাৎ জলভরা মেঘ। এ জাতীয় উচ্চগামিতা বা সাধারণতঃ এই মেঘের উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে তিন হাজার থেকে দশহাজার ফিটের মধ্যে। এবং এর রং খুব মিশকালো হয়। আকাশে এ মেঘের আবির্ভাব মানে বৃষ্টির আগমন বার্তা ঘোষণা।

স্টেট্রো কিউ মিউলাস মেঘ অর্থাৎ জলহীন মেঘ। সাধারণতঃ বঙ্গভূমির আকাশে শরৎকালে এই মেঘের আমদানি হয়ে থাকে। সাধারণতঃ সমতল ভূমিরই আকাশে এই মেঘ লক্ষ্য করা যায়। পেঁজাতুলোর মত এর চেহারা। বড় জোর হাজার ফিট পর্যন্ত উঁচুতে এর অবস্থান। শরতে একপশলা বৃষ্টির পরই ঘটে যায় স্টেট্রাস মেঘের অন্তর্ধান।

আলট্রো স্টেট্রাশের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় দশ থেকে কুড়িহাজার ফিট। আলট্রো কিউ মিউলাসও প্রায় সম গোত্রীয়! উচ্চতায় প্রায় ঐ একই পর্যায়ভূক্ত। প্রথমটি হয় ছাই রং এর আর দ্বিতীয়টি হয় নীলাভ। এই মেঘ দুটি যদিও উচ্চতার মেঘ, তবুও আগে বর্ণিত মেঘের মত অত অস্বচ্ছ নয়। বরং এর মধ্যে দিয়ে চাঁদ বা সূর্যকে ঘষা কাচের মত পরিলক্ষিত হয়।

একেবারে সর্ব উচ্চতার মেঘ হল "সিরোকিউ মিউলাস" বা "সিরাস"। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে তেইশ কি চব্বিশ হাজার ফিট পর্যন্ত বা তা থেকে আরও উঁচুতে অর্থাৎ এ মেঘ সময় সময় রাধানাথ (এভারেস্ট শৃঙ্গ) অপেক্ষাও উচ্চে থাকে। অর্থাৎ অতি উচ্চে এর অবস্থিতি। যে জন্য এই মেঘটির রূপ ঠিক মত বর্ণনা করা যায় না। তবে বলতে পারি এদের সবগুলির রংই ঘন নীল আকাশের গায়ে পেঁজা তুলোর মত সাদা। মধ্যে মধ্যে এরা ধুসর বর্ণও ধারণ করে।

মেঘ নিয়ে গবেষণা খুব অল্পই হয়েছে। কারণ মেঘের অবস্থিতি স্তর ভেদ স্থান ও সময় পরিবর্তনের কারণ প্রভৃতির রহস্য ভেদ করতে আরো কিছু দিন সময় লাগবে।

92 শরৎ চ্যাটার্জি রোড, হাওড়া 711104

ইলেকট্রনিক্সের কথা ঃ তিন

বিপ্লব ব্যানার্জী

পূর্ববর্তী তিনটি সংখ্যা যথাক্রমে ইলেকট্রনিক্সের গোড়ার কথা, ইলেকট্রনিক্সের কথা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে পদার্থের পারমাণবিক গঠন, পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী এবং অন্তরক সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এবার তাহলে সরাসরি ট্রানজিস্টারের কথায় ফিরে আসা যাক। এখন আমরা জানি যে—273° সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় একেবারে বিশুদ্ধ জার্মেনিয়াম ও সিলিকন উভয়ই সম্পূর্ণ অন্তরক (perfect insulator) হিসাবে কাজ করে। এখানে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ (pure) বলতে সেই ধরনের একটা স্বকীয় অর্ধপরিবাহীর কথা বলা হচ্ছে যে অর্ধপরিবাহীর 10^{10} সংখ্যক পরমাণুর মধ্যে মাত্র একটা অন্য পরমাণু অবিশুদ্ধ হিসাবে বর্তমান আছে। এখন একটা ভারী মজার ব্যাপার হল যে 27° সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় এই ধরনের একটা প্রায় সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ জার্মেনিয়াম ক্রস্টালের প্রতি 10^8 সংখ্যক জার্মেনিয়াম পরমাণুর মধ্যে যদি মাত্র 1টা ফসফরাস মৌলের পরমাণু অশুদ্ধি হিসাবে যোগ করা যায় তাহলে জার্মেনিয়াম ক্রস্টালের মধ্য দিয়ে তড়িৎ পরিবাহিতা 12:1 অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। এভাবে প্রায় সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ জার্মেনিয়াম বা সিলিকন ক্রস্টালের মধ্যে প্রয়োজন মত অশুদ্ধি মৌলের পরমাণু বিভিন্ন অনুপাতে মিশিয়ে তৈরি হয় P-type ও N-type crystal এবং কয়েকটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় একটি P-type ও একটি N type মিলে তৈরী হয় একটি PN crystal বা PN Junction Diode। ক্রস্টালের মধ্যে একটি ইলেকট্রন ও একটি হোল পরস্পর যুক্ত হয়ে ইলেকট্রন হোল জোড়া তৈরি করে। জার্মেনিয়াম ক্রস্টালের বেলায় এই election hole pair-এর জীবনকাল বা স্থায়িত্ব হল 100 microsecond এবং সিলিকন ক্রস্টালের বেলায় এই electron hole pair এর জীবনকাল বা স্থায়িত্ব হল 50 microsecond।

সোজাসুজিভাবে আমরা বলতে পারি যে একটা PN Junction Diode-এ P-side এ positive voltage এবং N-side এ negative voltage দিলে PN crystal এর মধ্যে একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ ঘটে এবং Diode এর এই অবস্থাটিকে বলা হয় Forward biased আবার P-side-এ negative voltage এবং N-side এ positive দিলে PN crystal এর মধ্য দিয়ে প্রায় কোন রকম বিদ্যুৎ প্রবাহ ঘটে না। যৎসামান্য মাইক্রোঅ্যামপিয়ার কারেণ্ট (μA) যা মিটারে নির্দেশ করে তা হল স্বাভাবিক ঘরের তাপমাত্রায় (25°C to 27°C) কিছু Co-valent bond ভেঙ্গে গিয়ে মুক্ত electron সৃষ্টি করে যা ক্রস্টালের উপরিতলেস্থ এক বিন্দু থেকে আরেক বিন্দুতে বিদ্যুৎ প্রবাহের আকারে মিটারে প্রকাশ পায় এবং Diode এর এই অবস্থাটিকে তখন বলা হয় Reverse biased। Diode এর প্রধান কাজ হল, যে কোন ধরনের বিদ্যুৎ প্রবাহ AC Current (Alternative Cycle Current) বা AC Current (Direct Cycle Current) Diode এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করলে তাকে একমুখীকরণ করা। একটা সিলিকন মৌল দিয়ে তৈরি PN Junction প্রায় 200°C তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে কিন্তু জার্মেনিয়াম মৌল দিয়ে তৈরি ঐ একই PN junction সহ্য করতে পারে মাত্র 100°C পর্যন্ত। সিলিকন দিয়ে তৈরি PN junction voltage drop হয় 0.7v অপর দিকে জার্মেনিয়াম দিয়ে তৈরি PN junction voltage drop হয় প্রায় 0.3v আর এই voltageটিকে বলা হয় Diode এর knee voltage অর্থাৎ এর নিচে কোন Voltage Diode এর across এ আরোপ করলে Diode বিদ্যুৎ পরিবহণ করতে পারে না। Diode এর আরও বহুরকমের তথ্য সমৃদ্ধ গুণাবলী এবং বিভিন্ন রকম Diode সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী অধ্যায়গুলির জন্য তোলা রইল। Transistor সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান লাভ করতে গেলে Diode সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধ্যান ধারণা থাকা বিশেষ প্রয়োজন। তাই Diode সম্বন্ধে এই যৎসামান্য কিছু তথ্য জানানো হল। এবার তাহলে Transistor নিয়ে আবার শুরু করা যাক। ট্রানজিস্টার সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই প্রশ্ন আসে ট্রানজিস্টার কি এবং কেমনভাবে কাজ করে। কত রকমের Transistor আছে এবং তাদের গঠন প্রকৃতিই বা কি ! কিভাবে Transistor তৈরি হয় এবং কিভাবে তারা কাজ করে, ব্যবহারিক দিক দিয়ে কিভাবে আমাদের প্রয়োজন মতো কাজ করান হয় ইত্যাদি হাজারো রকমের প্রশ্ন।

এখন Transistor বস্তুটি কি এ প্রশ্নের উত্তর জানতে গেলে প্রথমেই জানতে হবে Transistor শব্দটা কিভাবে তৈরি হল।

Transistor শব্দটার প্রথম অংশ Tran = Transfer এবং দ্বিতীয় অংশ sistor = Resister।

1. Transistor = Transfer-resistor। এ হল এক ধরনের বস্তু যা তড়িৎপ্রবাহ সরবরাহ করে একটা খুব কম রোধযুক্ত তড়িৎবর্ত্তনীতে। আমরা সচরাচর বাজারে যে চালু Transistor গুলি দেখি তার কিছু ভাগ হল Bipolar Junction Transistor। Junction হল দুটো ভিন্ন প্রকৃতির বস্তু তলের সংযোগস্থল বা মিলনক্ষেত্র। দুটো বিপরীতমুখী বৈদ্যুতিক আধানকে বলা হয় Bipolar যার একটা হল electron আর অন্যটা হল hole। অর্থাৎ Bipolar transistor-এ জোড়ায় জোড়ায় electron-hole এর বৈদ্যুতিক আধান পরিবর্তনের সূত্রটিকে কাজে লাগিয়ে charge বা আধান সরবরাহ করা হয়। কাজেই Transistor হল তিন বা চার তড়িৎদ্বার বিশিষ্ট একটা solid-state electronic device বা বস্তু যার চালনা পদ্ধতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে কিভাবে তার মধ্যে বৈদ্যুতিক আধান প্রবাহিত হচ্ছে তার গতিপ্রকৃতির উপর। Transistor-এর কৃষ্টাল মধ্যস্থিত বৈদ্যুতিক আধান পরিবহনের ব্যাপারটি তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। (1) ইলেকট্রন-হোল যুগ্মের উৎপত্তি, (2) তাদের সংযুক্তি এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির উপর। আরও সোজাভাবে বলা যায় যে Transistor হল জার্মেনিয়াম বা সিলিকন মৌল দিয়ে তৈরি এমন একটা single-crystal unit (কিছু অশুদ্ধি সহ) যাতে তিনটি তল বা প্রলেপ অর্থাৎ layer আছে। একটা ট্রায়োড jnnction ট্রানজিস্টরের প্রধান অংশ হল তিনটি,—(1) একটি single crystal, (2) তিনটি তড়িৎদ্বার, (3) একটি envelope বা আবরণী যার মধ্যে ঐ single ctystalটি থাকে। এই তিনটি তড়িৎদ্বার হল যথাক্রমে কালেকটর (collector), বেস (Base) ও এমিটার (Emitter)। কোন কোন Transistorএ আবার চারটি তড়িৎদ্বারের একটি ট্রানজিস্টারের ভিতরে Body/Envelop অর্থাৎ খোলস বা আবরণীর সঙ্গে যুক্ত থাকে। পৃথিবীর যাবতীয় Transistor-কে প্রধানতঃ দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়, 1) PNP-type, 2) NPN-type।

PNP-type transistor-এর ক্ষেত্রে কালেক্টর (collector) ও বেস (Base) হচ্ছে negative, এমিটারের (Emiter) সাপেক্ষে। আবার NPN transistor-এর ক্ষেত্রে কালেক্টর (Collector) ও বেস (Base) হচ্ছে positive, এমিটারের (Emitter) সাপেক্ষে। অর্থাৎ PNP Transistorকে কার্যকরী করতে গেলে কালেক্টর ও বেসকে negative voltage সরবরাহ করতে হবে আর এমিটারকে রাখতে হবে positive ভোল্টেজে। আবার NPN Transistorকে কার্যকরী করতে গেলে কালেক্টর ও বেসকে positive ভোল্টেজ সরবরাহ করতে হবে আর এমিটারকে রাখতে হবে negative ভোল্টেজে। আপাতঃ দৃষ্টিতে একটা junction transistor হল দুটো junction

অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ও
শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

ছোটদের বিশ্বকোষ

[ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ]

১ম : ৩৫·০০ ; ২য় : ২৫·০০ ; ৩য় : ৩০·০০ ;
৪র্থ : ৩৫·০০ ; ৫ম : ২৫·০০ ; ৬ষ্ঠ : ৪০·০০

সভ্যতা-সংস্কৃতি-জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখাই আজ দুরন্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে। ক্রমাগত নিত্যনোতুন তথ্যে আর তত্ত্বে পরিপুষ্ট হচ্ছে তার ভাণ্ডার। সত্যিকারের মানুষ হতে হলে, এ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে নেওয়া উচিত সেই ছোটবেলা থেকেই।

...বইটি বর্ণানুক্রমিক করলে তা কিশোর পাঠক-পাঠিকার কাছে সহজবোধ্য বা চিত্তাকর্ষক হতো না, দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমরা তা অনুভব করেছি। তাই গ্রন্থের কলেবর অযথা বৃদ্ধি না করে, বইটিকে আমরা বিষয়বস্তু হিসেবে ভাগ করে নিয়েছি।

....ছেলেমেয়েদের কতটুকু জানা উচিত, কতটুকু তথ্য দিলে তারা তা গ্রহণ করতে পারবে—কোন্‌টা তাদের পক্ষে আবশ্যক এবং বুঝবার পক্ষে কষ্টকর, এই মাত্রাজ্ঞানের অভাব বইটির কোথাও অনুভব করতে দেননি সম্পাদকদ্বয়। ফলে বইটি সার্থক কিশোরপাঠ্য হয়ে উঠতে পেরেছে—হয়েছে সহজবোধ্য ও চিত্তাকর্ষক।

সুকুমার সরকার-এর

বুক অব্ নলেজ ১৬·০০

কে? কি? কোথায়? কেন? কবে?—এ বইতে তরুণ বা শিশুমনের এই কৌতূহলকে শ্রদ্ধার সঙ্গে সংবর্ধিত করা হয়েছে। তার চির-অশান্ত জ্ঞানপিপাসাকে ছোট-ছোট প্রশ্ন আর উত্তরের মধ্যে দিয়ে কিছু পরিমাণে পরিতৃপ্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর নির্বাচন, নোতুন তথ্য ও তত্ত্বের সংযোজন, ভাষার সরলতা বইটির উৎকর্ষতা ও জনপ্রিয়তা বাড়িয়েছে সন্দেহ নেই। তিরিশটি সংস্করণ হয়ে যাওয়া এ-বইটির কথা নোতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কোলকাতা ৭০০০৭৩

diods-এর সংযুক্তি এবং n-p-n transistor-এর ক্ষেত্রে মনে হয় যেন একটা p-type অর্ধপরিবাহীর খুব পাতলা একটা স্তর দুটো n-type অর্ধপরিবাহীর মাঝখানে sandwiched বা পিষ্ট হয়ে আছে। অনুরূপভাবে p-n-p transistor-এর ক্ষেত্রে মনে হয় যেন একটা স্তর দুটো p-type অর্ধপরিবাহীর মাঝখানে sandwiched বা পিষ্ট হয়ে আছে। n-p-n ও p-n-p transistor-এর মধ্যভাগের স্তর বা layerটিকে বলা হয় Base region বা Base অঞ্চল যার বেধ বা thickness হল কাছাকাছি 25 micrometer-এর মতো (25×10^{-6} meter। প্রযুক্তিগতভাবে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় Transistor তৈরি করা সম্ভব এবং তা নির্ভর করে প্রধানত তিনটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে অর্ধপরিবাহীর মধ্যে অশুদ্ধি মিশ্রণ করার কৌশলের উপর। এখন কোন একটা অর্ধপরিবাহীতে অশুদ্ধি মিশ্রণ করা সম্ভব হয়; 1) by growing, 2) by alloying এবং 3) by diffusing পদ্ধতি অবলম্বন করে। এখন growing, alloying এবং diffusing এই তিনটি পদ্ধতিতে যে বিভিন্ন ধরনের Transistor fabricate করা হয় তাদের নামকরণ হল যথাক্রমে,—

1) grown-junction transistor
2) fused junction transistor
3) surface-barrier transistor
4) microalloy transistor (MAT)
5) micro-alloy diffused transistor (MADT)
6) post-alloy diffused types (PADTS)
7) planar transistor
8) epitanial diffused transistor
9) mesa or diffused base transistor
10) double diffused transistor ইত্যাদি।

এভাবে transistor তৈরির পদ্ধতিগুলি কাজে লাগিয়ে Unijunction transistor (UJT), Field Effect Transistor (FET), Metal Oxide Semiconductor Transistor (MOS). n-MOS Transistor, p-MOS Transistor, Complementary or COMS Transistor Insulated Gate or IGFET, High Electron Mobility Transistor (HEMT), Metal Insulator Semiconductor FET or MISFET, Metal Semiconductor FET or MESFET ইত্যাদি বহুরকমের Transistor তৈরি করা বর্তমান যুগে সম্ভবপর হয়েছে। এবার নিচে কতকগুলি অঙ্কন-চিত্র দেওয়া হল যা দেখে কোনটা কি ধরনের Transistor এবং কিভাবে তাদের Biasing করতে হয় তা বুঝে নেওয়া খুবই সহজসাধ্য ব্যাপার হবে।

সঙ্কেত : E = Emiter, B = Base, C = Collector
a) = PNP Junction ট্রানজিস্টারের symbol বা চিহ্ন।
b) = PNPJunction ট্রানজিস্টারের schemetic চিহ্ন।
c) = PNP Junction ট্রানজিস্টারের Biasing অবস্থা।
d) = NPN Junction ট্রানজিস্টারের symbol বা চিহ্ন।
e) = NPN Junction ট্রানজিস্টারের schemetic চিহ্ন।
f) = NPN Junction ট্রানজিস্টারের Baising অবস্থা।

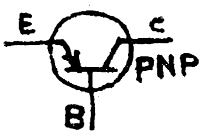

(a)

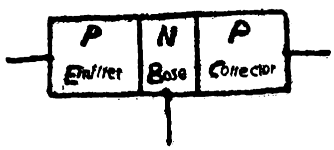

(b)

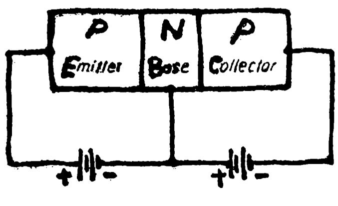

(c)

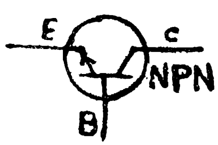

(d)

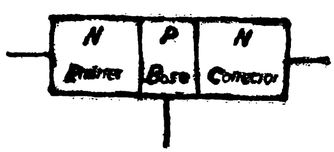

(e)

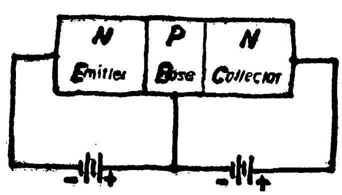

(f)

17 যাদব ঘোষ রোড, সরশুনা, কল-61।

রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা

হিমাংশু পাল

রমেন একজন চল্লিশ বৎসের প্রৌঢ়। এখানে সে একজন পাগল বলেই পরিচিত। অথচ আমার সঙ্গে সে কথা বলে একজন স্বাভাবিক মানুষের মত। মাঝে মাঝেই সে আসে আমার কাছে— বর্ণনা করে তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী। সবাইকেই সে বলতে চায় ঐ বিচিত্র অভিজ্ঞতা কিন্তু কেউ বিশ্বাস করে না— পাগল বলে তাকে তাড়িয়ে দেয়। আমিই একমাত্র লোক যে ওর কথা শোনে প্রকৃত সমঝদারের মত। রমেনের অভিজ্ঞতা সত্যিই বিচিত্র।

1956 সালের 17ই ভাদ্র। তখন চাকদহে এত বাড়ি হয়নি। সমস্তটাই ছিল জঙ্গলে ভর্তি, কেবল মাঝে মাঝে দু-একটি আলো জানান দিত মানুষের অস্তিত্ব। রমেন তখন 20 বছরের টগবগে যুবক। একদিন দূরের গাঁয়ে সে গিয়েছিল বাজার করতে। ফিরতে ফিরতে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। অভ্যস্ত পথে সে দ্রুত বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎ সামনে জোরালো আলো ওর চোখ ধাঁধিয়ে দিল। রমেন দেখল সামনে রাস্তা জুড়ে বিরাট গোলক ও তার থেকে আলো নিঃসৃত হচ্ছে। হঠাৎ গোলকের মাঝখানে একটা দরজা খুলে সেখান দিয়ে একটা মই নেমে এল ও তা দিয়ে নেমে এল দুটো কিম্ভূতাকার জীব। তাদের দেহ গোল, গলা নেই, দেহর ওপরেই চৌকো মাথা বসানো। মাথা থেকে বেরোনো দুটো শুঁড়ের আগায় মোট ছটি পলকহীন চোখ। তাদের বুক থেকে তিনটে হাত নেমে গেছে। আর, দেহের নিচে দুটি চ্যাপ্টা পা।

রমেন পালাতে গেল। কিন্তু হঠাৎ একটা নীলাভ রশ্মি যানটি থেকে নির্গত হয়ে তাকে অবশ করে দিল। কিম্ভূতাকার জীবদুটি তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে একটা খাচায় আটকে রাখল। উত্তেজনায়, ভয়ে রমেন অজ্ঞান হয়ে গেল।

হঠাৎ রমেনের জ্ঞান ফিরল। সে দেখল জীবদুটি তার দেহ অদ্ভুত একটি আবরণে আবৃত করে দিল। যানটা থেমে গেছে। দরজাটা খোলা। জায়গাটি একটা গ্রহ মত। গ্রহটি থেকে তাপহীন গোলাপী আলো বিকিরিত হচ্ছে ও তাই গ্রহটিকে আলোকিত করে রেখেছে। আকাশে কোন সূর্য বা চন্দ্র নেই।

এরপর ওরা রমেনকে একটা ঘন, কালো পানীয় খেতে দিল। খেতে বিস্বাদ হলেও এটা তার দেহকে তরতাজা করে দিল। এরপর ওরা রমেনকে ওদের ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গেল ও রমেনের কাঁধ থেকে মসৃণভাবে কিছুটা মাংস কেটে নিল। একটা টেস্টটিউবে কিছু রক্তও সংগ্রহ করল ওরা। এছাড়া ওরা রমেনের চুল ও নখও নিল। অসহায় রমেন সব দেখতে লাগল।

এরপর ওরা রমেনের দেহ একটা অক্সিজেনের সিলিণ্ডার লাগিয়ে দিয়েছে। রমেন এখন সর্বত্র যেতে পারে। সে চেনে ওদের সমস্ত যান যেখানে আছে সেই জায়গাটা। মাঝে মাঝে রমেন যানগুলির কাছে যায় ও দেখে রাখে কিভাবে ওটা চালাতে হয়। রমেনের লক্ষ্য, কোনদিন সুযোগ পেলে পৃথিবীতে পালিয়ে যাওয়া।

এরপর সত্যই একদিন সুযোগ এল। জীবগুলির অন্যমনস্কতার সুযোগে রমেন চুপিচুপি ওদের একটা যানে উঠে পড়ল। সে একটা বোতাম টিপল, যেটা তার যানটিকে পৃথিবীর দিকে চালনা করতে আরম্ভ করল। রমেন পেছনে তাকিয়ে দেখল— অজস্র যানে করে ভীনগ্রহবাসীরা তাকে তাড়া করেছে। উত্তেজনায় রমেন অজ্ঞান হয়ে গেল।

জ্ঞান ফিরলে রমেন দেখল সে ভারত মহাসাগরের মধ্যে জেলেদের মাছ ধরার নৌকায় শুয়ে আছে। মাঝিদের কথাবার্তা শুনে সে বুঝল হঠাৎ মাঝিরা মহাকাশ থেকে একটা নীল গোলককে সমুদ্রে পড়তে দেখে কৌতূহলী হয়ে এদিকে আসে ও অজ্ঞান অবস্থায় ভাসমান রমেনকে উদ্ধার করে। রমেন বুঝল, পিঠে অক্সিজেনের সিলিণ্ডার থাকার জন্যই, সে ভাসছিল। নইলে তার যানের মত সেও চূর্ণ হয়ে সমুদ্রের অতলে তলিয়ে যেত।

তারপর নানা উপায়ে সে ফিরে এসেছে চাকদায়। উড়ন্ত কিছু দেখলেই সে পাগলের মত অমানুষিক ভাবে চীৎকার করতে থাকে। ভয় পায়, আবার ভীনগ্রহবাসীরা ওকে নিতে আসছে। সে দেখায় তার কাঁধের সেই দূষিত ক্ষত, যেখান থেকে ঐ গ্রহের প্রাণীরা মাংস তুলে নিয়েছিল নৃশংস ভাবে —গিনিপিগের মত পরীক্ষার জন্য। অনেক নামকরা ডাক্তারকে আমি ঐ ক্ষত দেখিয়েছি— কেউই ওটা আরোগ্য করতে পারেননি। সবকিছু না মানলেও, ঐ ক্ষত আমি অবিশ্বাস করি কিভাবে ?

চাকদহ রামলাল অ্যাকাডেমী, নদীয়া

জুলে ভার্ন-এর

দ্য ব্ল্যাক ডায়মন্ডস

চিত্রনাট্য - অনিল কর্মকার
রূপায়ণ - গৌতম কর্মকার

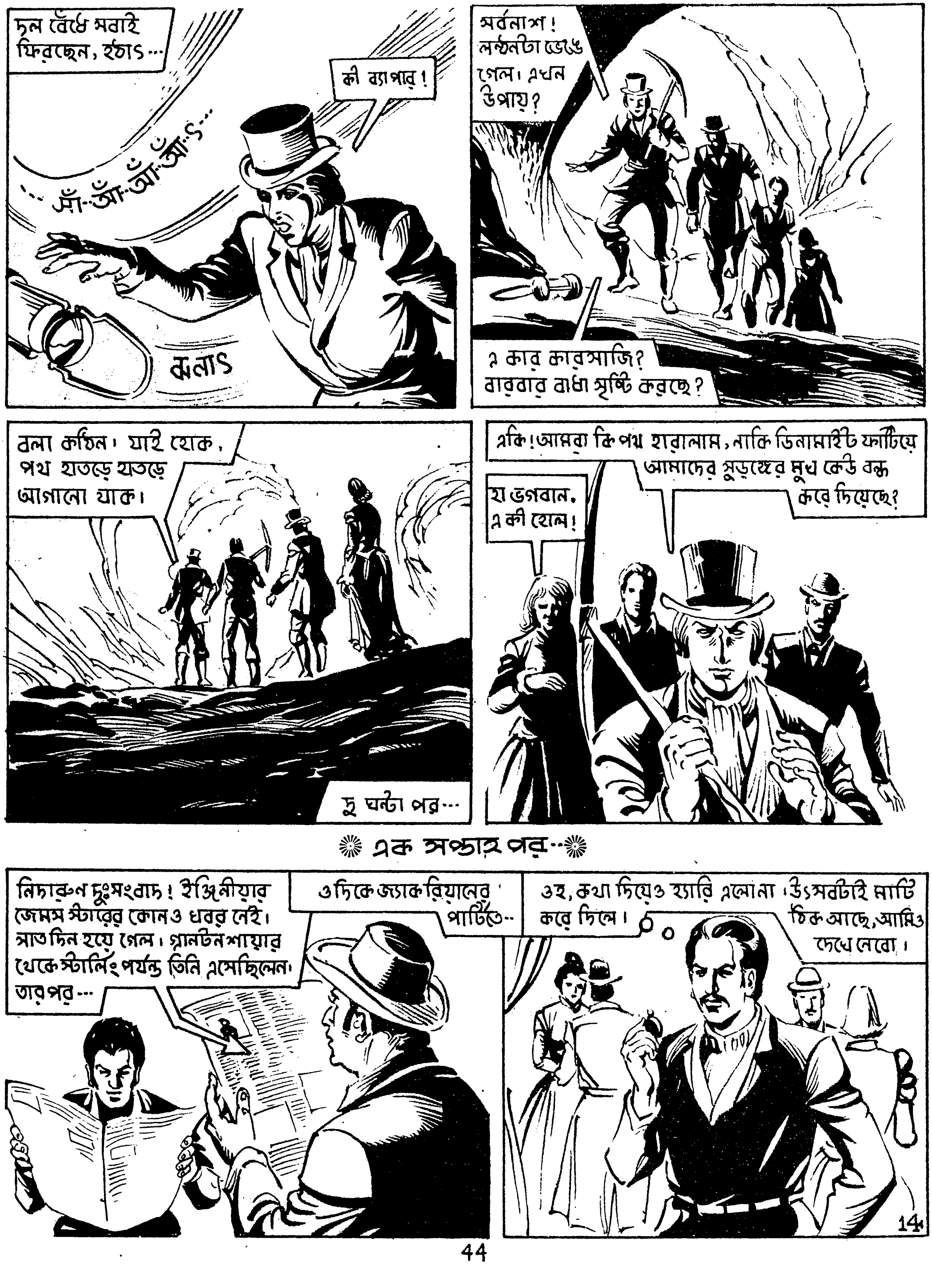

দল বেঁধে সবাই ফিরছেন, হঠাৎ···
কী ব্যাপার!
···সাঁ-আঁ-আঁ-আঁঃ···
ঝনাৎ
সর্বনাশ! লন্ঠনটা ভেঙে গেল। এখন উপায়?
এ কার কারসাজি? বারবার বাধা সৃষ্টি করছে?
বলা কঠিন। যাই হোক, পথ হাতড়ে হাতড়ে আগানো যাক।
দু ঘন্টা পর···
একি! আমরা কি পথ হারালাম, নাকি ডিনামাইট ফাটিয়ে আমাদের সুড়ঙ্গের মুখ কেউ বন্ধ করে দিয়েছে?
হা ভগবান, এ কী হোল!
এক সপ্তাহ পর···
নিদারুণ দুঃসংবাদ! ইঞ্জিনীয়ার জেমস স্টারের কোনও খবর নেই। সাত দিন হয়ে গেল। গ্লানটনশায়ার থেকে স্টার্লিং পর্যন্ত তিনি এসেছিলেন। তারপর···
ওদিকে জ্যাক রিয়ানের পার্টিতে···
ওহ, কথা দিয়েও হ্যারি এলো না। উৎসবটাই মাটি করে দিলে।
ঠিক আছে, আমিও দেখে নেবো।
14

সে সুযোগ কিন্তু এলো না। তার আগেই, বারোই ডিসেম্বর রাতেই ঘটে গেল একটা অলৌকিক দুর্ঘটনা।
স্কটল্যান্ড উপকূলের একটি ছোট্ট বন্দর - আরভিন। এখানে রয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোকস্তম্ভ। আর আরভিন শহরের প্রান্তে রয়েছে একটি কেল্লা। চলতি নাম - ডানডোনাল্ড কেল্লা। বসতি থেকে দূরে নির্জন এক টিলার উপর কেল্লাটি দাঁড়িয়ে। ওখানে মানুষ-জন কেউ থাকে না। ভয়ঙ্কর সব প্রেতাত্মা ওখানে বাস করে, এমন কুসংস্কারে সবাই বিশ্বাস করে। অন্ধকার রাতে মিনারের চূড়ায় চূড়ায় আগুনের শিখা হঠাৎ লক লক করে জ্বলে ওঠে।
আগুন-ডাইনী, আগুন-ডাইনী! ঐ দেখো - ডানডোনাল্ড কেল্লার চূড়ায় আগুন-ডাইনী নাচছে।
বারোই ডিসেম্বরের রাত, জ্যাক রিয়ানের আড্ডা...
একি! একটা জাহাজ। সব কটা পাল তুলে দিয়ে পড়িমরি করে ছুটে আসছে।
আর খানিক পরেই ডুবো পাহাড়। সর্বনাশ হয়ে যাবে। চলো, বাইরে চলো...
থামো, থামো তোমরা। শুনতে পাচ্ছো - জাহাজ থামাও।
সামনে পাহাড় - ডুবো পাহাড়।
সংকেত দাও... শিগগির!
কী করি? ঝড়ের দাপটে যে মশাল জ্বালানো যাচ্ছে না।
5

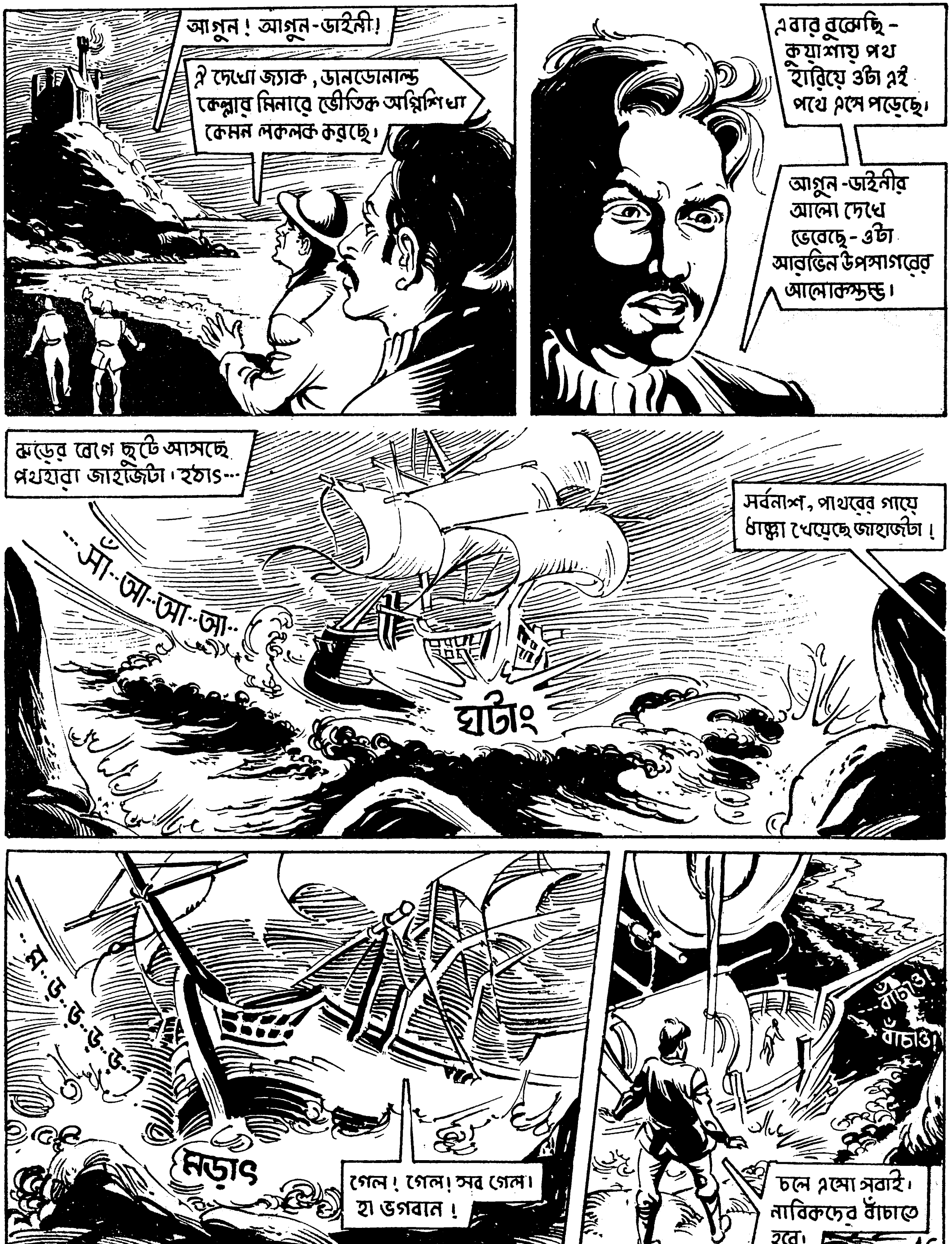
আগুন! আগুন-ডাইনী!
ঐ দেখো জ্যাক, ডানডোনাল্ড কেল্লার মিনারে ভৌতিক অগ্নিশিখা কেমন লকলক করছে।
এবার বুঝেছি - কুয়াশায় পথ হারিয়ে ওটা এই পথে এসে পড়েছে।
আগুন-ডাইনীর আলো দেখে ভেবেছে - ওটা আরভিন উপসাগরের আলোকস্তম্ভ।
ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে পথহারা জাহাজটা। হঠাৎ...
সর্বনাশ, পাথরের গায়ে ধাক্কা খেয়েছে জাহাজটা!
...সাঁ..আ..আ..আ..
ঘটাং
..হু..উ..উ..উ..উ..
মড়াৎ
গেল! গেল! সব গেল। হা ভগবান!
বাঁচাও!
বাঁচাও!
চলে এসো সবাই। নাবিকদের বাঁচাতে হবে।
16

ভেইনু বাপ্পু টেলিস্কোপ

জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের কথা বলছি। হায়দ্রাবাদের নিজামিয়া মান মন্দিরের টেলিস্কোপে নিয়মিত ভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন ঐ সংস্থার এক বিজ্ঞানী, তার সঙ্গে সব সময়েই থাকত তাঁর বছর দশেক বয়সের ছেলে। বিজ্ঞানীটির নাম এম কে বাপু এবং ছেলেটির নাম ভেইনু। জ্যোতির্বিজ্ঞানের বর্তমান কালের ইতিহাসে নামটি অমর হয়ে আছে।

ভেইনু বাপু

ভেইনু বাপুর শৈশব এবং কৈশোরে কেটেছিল মানমন্দিরেই অতি ছেলেবেলা থেকে বাবার সঙ্গে যেত টেলিস্কোপে যেখানে দূরের তারার রহস্যভেদের জন্য আকাশের বিভিন্ন স্থানের ফোটোগ্রাফ নেওয়া হয়। বর্ণালী মাপা হত। আকাশের নক্ষত্রদের পরিচয় ভেইনুর কিশোর মনে গভীর ভাবে লেখা হত। বড় হয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে আরও জানবার ইচ্ছা তার মনপ্রাণকে ঘিরে থাকত।

বাপ মায়ের একমাত্র ছেলে, তাই একটু বেশি আদরের। মার কাছে আবদার করে পয়সা জোগাড় করত, কিন্তু আইসক্রীম বা চানাচুর খাওয়ার জন্য নয়। সে সব পয়সা জমিয়ে কিন্ত তেকোণা কাচের প্রিজম্‌, ছোট লেন্‌স্‌ তাই দিয়ে যন্ত্রপাতি গড়ে তোলার চেষ্টা চলত। যখন সে কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র সত্যসত্যই একটা সেন-ট্রোগ্রাফ বানিয়ে তুলল। শোয়ার ঘরের জানলায় আকাশের দিকে মুখ করে যন্ত্রটি রাখা হল। রাত্রে আশে পাশের আলো নিভিয়ে দেওয়ার পরে যন্ত্রটির ঢাকা খোলা হত। আর ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগে বন্ধ করা হত। ছোট যন্ত্র তাই রাত্রির এক্সপোজারে যথেষ্ট পরিষ্কার ছবি উঠত না, তাই কয়েক রাত চেষ্টা করে ছবি তোলা হত। একবার পর পর ছ'রাত্রি চলল পরীক্ষা। ডেভেলপ করে দেখা গেল রাতের আকাশের আলোর সুন্দর বর্ণালিপি ধরা পড়েছে। বাতাসের অক্সিজেনের সবুজ রেখাটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হল ভেইনুর, পদার্থ বিদ্যায় এম. এস.-সি করলেন। চাকরির খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু সেগুলি ভেইনুর পছন্দ নয়। জ্যোতির্বিদ্যার কাজ তিনি করবেনই, তার জন্য যদি গোড়া থেকে শুরু করতে হয়, তাতেও তিনি রাজি। দিনে সময় কাটে লাইব্রেরীতে জ্যোতির্বিদ্যার নিত্য নতুন আবিষ্কারের খোঁজ রাখেন সব সময়েই। আর রাত্রে নিজের তৈরি ছোট টেলিস্কোপে নজর রাখেন আকাশের ওপর। কয়েকটি ছোটখাট প্রবন্ধও প্রকাশ করেছেন কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পত্রিকায়।

একদিন খোঁজ পেলেন যে বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী হার্লো শাপ্‌লি এসেছেন ভারতে। হায়দ্রাবাদে আসছেন কয়েকদিনের মধ্যেই। সোজা তাঁর হোটেলে গিয়ে দেখা করলেন ভেইনু বাপু। শাপ্‌লি অবাক; জ্যোতির্বিদ্যার কাজ করার এত আগ্রহ। কথা দিলেন, নিশ্চয়ই তিনি চেষ্টা করবেন।

তাঁরই চেষ্টায় ভেইনু পেলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চাবিকাঠি আর প্রাণ ভরে কাজ করবার জন্য নতুন উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি। মাস কয়েকের মধ্যেই তাঁর চোখে ধরা পড়ল এক নতুন ধূমকেতু; কয়েক রাত্রের চেষ্টায় সেটার গতিপথ নির্ণয় হল। ভেইনু আর তার দুজন সহযোগীর নামে নামকরণ হল নতুন ধুমকেতুটির। বাপু-বক-নিউকার্ক ধূমকেতু আজ পর্যন্ত আকাশের একমাত্র ধূমকেতু যাতে এক ভারতীয় বিজ্ঞানীর কীর্তির স্বাক্ষর রয়েছে।

ডক্টরেটের কাজ শেষ করলেন ভেইনু তিন বছর পুরো হওয়ার আগেই; আরও দেড় বছর রইলেন আমেরিকায় কয়েকটি মানমন্দিরের অনুরোধে। তাদের অনেকেই চেয়েছিল যেন তিনি ওদের সঙ্গে থেকে কাজ করেন। কিন্তু ভেইনুর এক কথা, তিনি ভারতে ফিরে যাবেনই। ওখানে অনেক কাজ পড়ে রয়েছে, নতুন করে আমাদের জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা শুরু করতে হবে।

1953 সালে প্রতিশ্রুতিমত ভারতে ফিরলেন ডঃ ভেইনু বাপু কিন্তু একেবারেই বেকার অবস্থায়। তবুও এর মধ্যে তিনি ওখানকার টেলিস্কোপ দিয়ে সংগৃহীত তারার আলোর বর্ণালিপিগুলির বিস্তার করতে লাগলেন। নিজামিয়ার তৎকালীন ডিরেক্টর ডঃ আকবর আলি যাঁর সাহায্য চাইলেন নতুন টেলিস্কোপ সংগ্রহের ব্যাপারে। বর্তমান জাপাল-বাঙ্গাপুর মানমন্দিরের 48 ইঞ্চি টেলিস্কোপটির আদি ইতিহাস তখনই শুরু হয়েছিল। এক বছর বাদে তার

হঠাৎ ডাক পড়ল উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সম্পূর্ণানন্দের দফ্তরে ওখানে একটি নতুন মানমন্দির গড়ে তোলার জন্য। বাপু সেই কাজের ভার নিলেন; খুঁজে পেলেন নৈনিতালের কাছে একটি ছোট পাহাড় —ম্যানোরা পীক। স্থাপন করলেন একটি আধুনিক মানমন্দিরের।

সে সময়টা ভারতের ইতিহাসে একটি যুগ সন্ধির কাল। বছর দশেক আগে স্বাধীনতালাভের প্রাক্কালে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা কয়েকজন বিজ্ঞানীর পরামর্শ নিয়ে ভারতে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার প্রসারের জন্য একটি পরিকল্পনা করেছিলেন। তাইতে বেশ কয়েকটি সুপারিশের উপর জোর দেওয়া হয়; তাদের মধ্যে ছিল একটি আধুনিক মানমন্দির গড়ে তোলার জন্য; এমন মানমন্দির যেটিকে পৃথিবীর যে কোনও বড় মানমন্দিরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। নতুন স্বাধীন ভারতের সরকার এই সুপারিশগুলি মেনে নিয়েছিলেন। এবং তখনকার সবচেয়ে বড় সংস্থা যেখানে জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা চলে আসছে, সেই কোদাইকানাল মানমন্দিরের ওপর ভার পড়ল এই পরিকল্পনার বাস্তব রূপ দেওয়ার।

কাজ আরম্ভ করেছিলেন কোদাইকানাল মানমন্দিরের তখনকার ডিরেক্টর ডঃ অনিল কুমার দাস কিন্তু নানা কারণে সেটি বেশিদূর এগোয় নি। তাঁর অবসর গ্রহণের পর ভার নিলেন বত্রিশ বছরের যুবক ভেইনু বাপু। প্রথমে খোঁজ চলল একটি উপযুক্ত জায়গার জন্য। তামিলনাদের জাবাডি পাহাড়ের মাঝখানে চন্দন বনে ঘেরা একটি জায়গা বাছা হ'ল। ছোট কয়েকটি টেলিস্কোপ নিয়ে কাজ শুরু হ'ল কাভালুর মানমন্দিরের। 1972 সালে স্থাপিত হ'ল কার্ল জাইস্ কোম্পানীর তৈরি চল্লিশ ইঞ্চি ব্যাসের একটি আধুনিক টেলিস্কোপ।

কিন্তু চল্লিশ ইঞ্চি ব্যাসের টেলিস্কোপ দিয়ে ত আর বড় বড় মানমন্দিরের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যাবে না। তার জন্য চাই আরও বড় টেলিস্কোপ যার ব্যাস অন্তত পক্ষে দুই মিটার হতে হবে। বাইরের থেকে কিনতে গেলে এই রকম টেলিস্কোপের দাম অসম্ভব বেশি। ভেইনু বাপু ঠিক করলেন, আমাদের দেশেই গড়ে তুলতে হবে এই বৈজ্ঞানিক যন্ত্রটি। সমস্যা জটিল; অনেক উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগের প্রয়োজন হবে এই অতিসূক্ষ্ম অথচ বিরাট যন্ত্রটি বানাবার জন্য; কিন্তু ভেইনু বাপু দৃঢ়কল্প।

1974 সালে কাজ আরম্ভ হল। প্রথমে তৈরি হল একটি সুচিন্তিত নক্সা; টেলিস্কোপটির জটিল যন্ত্রপাতি খুঁটিনাটি হিসাব। টেলিস্কোপটি হবে প্রতিফলক শ্রেণীর, তার জন্য বিশেষ ধরনের সেরামিক (Ceramic) চাকতি জোগাড় হল ছোট বড় নানা মাপের। সবচেয়ে বড় চাকতিটির ব্যাস প্রায় আট ফিট। ওজন পাঁচ টন। এগুলিকে ঘষে ঘষে উত্তল, অবতল এমন কয়েকটি আয়না বানাতে হবে যাদের সমতার মান সাধারণ দৃষ্টিতে অকল্পনীয় সূক্ষ্ম। বড় প্রাথমিক প্রতিফলকটির পার্শ্ব চিত্র (Profile) হবে একটি নিখুঁত অধিবৃত্তের (Parabola) রূপে, তার উঁচু নিচুর মাপ এক মিলিমিটারের বিশ হাজার ভাগের এক ভাগের বেশি হলে চলবে না। এ যেন পঞ্চাশ কিলোমিটার ব্যাপী একটা মাঠকে এমন ভাবে সমতল করতে বলা যাতে কোথাও তার উঁচু নিচু এক মিলিমিটারের বেশি না হয়। আয়নাগুলিকে বসাতে হবে এক ইস্পাতের কাঠামোর মধ্যে, যা আকাশের সব দিকে ঘোরানো যাবে কিন্তু আয়নাগুলি স্থির অবস্থান থেকে একচুলও হেলবে না। বহু হিসাব করে কাঠামোটি বানান হল; ওজন দাঁড়াল একশ টনেরও বেশি আবার এটিকে ঘড়ির কাঁটার চেয়ে স্থির গতিতে ঘোরাতে হবে। পৃথিবীর আহ্নিক গতির সমান ভারে। তাও সাধিত হল; প্রয়োজন হল কয়েকটি অতি আধুনিক হাইড্রলিক বেয়ারিং এর (Hydralic Bearing) এবং উন্নত শ্রেণীর বৈদ্যুতিক মোটরের। আর প্রয়োগ করা হল এক উচ্চশক্তির কম্পিউটার যা শুধু এই টেলিস্কোপটির সূক্ষ্ম চলা ফেরার কাজে সাহায্য করবে না, আধুনিক নিরীক্ষণ কাজে বহু ব্যবহৃত হবে। এর উপরে থাকবে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার নানা রকমের পদ্ধতির ব্যবহার। শুধু যা দিয়েই এই টেলিস্কোপটি অতিসূক্ষ্ম মাপগুলিকে সম্ভব করবে। মহাকাশের বহু দূরের জ্যোতিষ্কগুলির ছবি পরিষ্কার ভাবে এনে ফেলবে জ্যোতির্বিদ্যার গবেষণার জন্য।

ভেইনু বাপু যন্ত্রটির সম্পূর্ণরূপ দেখে যেতে পারেন নি। 1982 খ্রীস্টাব্দের 19শে আগস্ট মিউনিকের একটি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি খোঁজ নিয়েছিলেন তাঁর টেলিস্কোপ প্রকল্পের অবস্থা সম্বন্ধে। ওখান থেকে টেলিফোন যোগে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য। তাঁর মৃত্যুর প্রায় তিন বছর পরে 1985 খ্রীস্টাব্দের 31শে অক্টোবর প্রথম ছবি দেখা গেল তাঁর টেলিস্কোপের মধ্যে দিয়ে; দুদিন বাদে তোলা হল প্রথম ফোটোগ্রাফ।

তার দুমাস পর 1986 খ্রীস্টাব্দের 6ই জানুয়ারি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী রাজীব গান্ধী ঐ টেলিস্কোপের স্তম্ভের উপর একটি মর্মর ফলক উন্মোচিত করলেন। টেলিস্কোপটির নামকরণ হ'ল ভেইনু বাপুর নামে, যিনি তাঁর সমস্ত হৃদয় মনপ্রাণ উৎসর্গ করে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের বহু দিনের স্বপ্ন সার্থক করেছেন।

ইণ্ডিয়ান ইনসটিটিউট অব অ্যাস্ট্রোফিজিক্স্,
ব্যাঙ্গালোর-75

কি করে জানব—নক্ষত্রের উপাদান

শংকর সেনগুপ্ত

আকাশের বুকে অসংখ্য নক্ষত্রের সমাবেশ। আমাদের অতি পরিচিত সূর্য তাদের মধ্যে একটি। নক্ষত্রের স্বরূপ কি, তাদের ভেতরেই বা কি আছে—এসব জানার আগ্রহ মানুষের মনে বাসা বেঁধেছে একেবারে সৃষ্টির আদিকাল থেকে। প্রথম প্রথম মানুষ খালি চোখেই তাকাত এই সব নক্ষত্রের দিকে। ক্রমে তারা বুঝতে পারল যে শুধু চোখের দৃষ্টির উপর নির্ভর করে জানা সম্পূর্ণ হবে না। তাই দৃষ্টি-শক্তিকে সাহায্য করতে আবিষ্কৃত হলো দূরবীন। দূরবীনের সাহায্যে নক্ষত্রের দূরত্ব ও অবস্থান সম্পর্কে জানা গেলেও তারা কি দিয়ে তৈরি সে সম্বন্ধে কিছু জানা সম্ভব নয়। উপাদান জানার তাগিদে বিজ্ঞানীরা নিত্য নতুন উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট হলেন। দূরবীনের সঙ্গে যুক্ত হলো ফটোগ্রাফ। আবিষ্কৃত হলো বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র।

প্রত্যেক রঙের আলোর একটি নিজস্ব তরঙ্গদৈর্ঘ্য আছে। আমরা যে সাদা আলো দেখি তা আসলে বিভিন্ন রঙের আলোর সংমিশ্রণ। এই মিশ্রিত আলোকে তাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অনুযায়ী প্রিজম বা গ্রেটিং-এর সাহায্যে বিশ্লেষণ করলে যে ছবি পাওয়া যায় তাকেই বলা হয় বর্ণালী। বর্ণালী পরীক্ষায় যে সব যন্ত্র, ব্যবহার করা হয় তাদের নাম স্পেকট্রোস্কোপ বা বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র স্পেকট্রোমিটার বা বর্ণালী মাপক ও স্পেকট্রোগ্রাফ যন্ত্র যাতে বর্ণালীর ছবি তোলা হয়। নক্ষত্রদের উপাদান নির্ণয় করার ব্যাপারটা মূলত নির্ভর করে আছে বর্ণালী বিদ্যার ওপরে।

নক্ষত্রেরা অতি বেশি উষ্ণ বলে তারা আলো বিকিরণ করে। সব আলোই তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ। নক্ষত্রদের দেহ থেকে যে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ বেরিয়ে আসে তাদের মধ্যে তিনটে অংশ নক্ষত্রদের সম্বন্ধে নানান তথ্য যোগায়। এই তিন অংশের প্রথমটিতে আছে সেই সব তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো যাদের চোখে দেখা যায়। এদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 8000A° থেকে 9000A°। নক্ষত্রদের দেহ থেকে বেরিয়ে আসা আলোর এই অংশের বর্ণালী নক্ষত্রদের উপাদান জানার কাজে ব্যবহার করা হয়। দ্বিতীয় অংশ হলো বেতার তরঙ্গ বা রেডিও ওয়েভস। বেতার তরঙ্গের দৈর্ঘ্য হলো কয়েক মিলি-মিটার থেকে সুরু করে কয়েকশ মিটার পর্যন্ত।

1931 সালে এই বেতার তরঙ্গের সন্ধান পান বিজ্ঞানী জানসুকি। নক্ষত্র দেহ থেকে বেতার তরঙ্গ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বেতার জ্যোতির্বিদ্যা বা রেডিও অ্যাস্ট্রনমি নামে জ্যোতি-র্বিজ্ঞানের এক নতুন দিক উন্মোচিত হলো। পালসার ও কোয়াসারের মতন চাঞ্চল্যকর নক্ষত্রেরা আবিষ্কৃত হলো এই নতুন বিজ্ঞানের সাহায্যে। বর্ণালীর যে তৃতীয় অংশের কথা বলা হয়েছে তা হলো অতি লাল বা ইনফ্রারেড অংশ যার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 7000A° থেকে এক মিলিমিটার পর্যন্ত। যদি কোন কারণে দৃশ্যমান বর্ণালীকে ঠিকমত ধরা না যায় সেখানে অতিলাল রশ্মি খুব কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

কেবলমাত্র পৃথিবীর বুকে বসেই যে নক্ষত্রদের সম্বন্ধে গবেষণা চালাতে হবে এ-ধরনের বাধ্যবাধকতা ক্রমশ দূর হতে লাগলো। উড়ন্ত বেলুন ও বিমানে করে গবেষণা চালানো আরম্ভ হলো। আজকাল কৃত্রিম উপগ্রহে নানাধরনের যন্ত্রপাতি পাঠিয়ে গবেষণা চালানো হয় যাতে নক্ষত্রদের দেহ থেকে বেরিয়ে আসা তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গকে সামগ্রিক ভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। 1966 সালে একটি অতি বেগুনি বা আলট্রা-ভায়লেট টেলিস্কোপ সমন্বিত উপগ্রহ পাঠানো হয়। উপগ্রহ-টির নাম হলো কোপারনিকাস। কোপারনিকাসের সাহায্যে নক্ষত্রের সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া গেছে। 1978 সালে আইনস্টাইন আবজারভেটারি নামে একটি যন্ত্র পাঠানো হয়েছিল মহাশূন্যে। এই যন্ত্রের সাহায্যে নক্ষত্রদের সুপার নোভা অবস্থার সম্বন্ধে নানান খবরাখবর মিলেছে।

বর্ণালী প্রধানত দু ধরনের। প্রথমটি হলো অবিরাম বা কনটিন্যুয়াস। এই ধরনের বর্ণালীতে সকল দৈর্ঘ্যের আলো উপস্থিত আছে। দ্বিতীয়টি হলো রৈখিক বর্ণালী বা ডিসক্রিটস্পেকট্রাম। এর মধ্যে বিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোই উপস্থিত থাকে। প্রত্যেক বস্তুরই নিজস্ব বর্ণালী আছে যা দিয়ে তাদের চেনা যায়। রৈখিক বর্ণালী আবার দু ধরনের হতে পারে। যেমন সোডিয়াম পরমাণুকে উত্তেজিত করলে যে বর্ণালী পাওয়া যায় তাতে মূলত দুটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের হলুদ রঙের রেখা পাওয়া যায়। এই বর্ণালীকে বলা হয় নির্গত বর্ণালী বা এমিসন স্পেকট্রাম। এই দুটি রেখা ডি লাইনস্ নামে পরিচিত। আবার সোডিয়াম বাষ্পের মধ্যে দিয়ে সাদা আলো পাঠালে যে আলো বেরিয়ে আসবে তার বর্ণালী বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তার মধ্যে দুটি কালো রেখা আছে। এই দুটি রেখার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ডি লাইনস-এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সমান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মৌলিক বস্তুরা যে সব তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো উৎপাদন করে তারা আবার সেই সব আলোই শোষণ করে। একে বলা হয় শোষিত বর্ণালী বা এ্যাবজরপসন স্পেকট্রাম। 1802 সালে বিজ্ঞানী উলাসটন নক্ষত্রের দেহ থেকে বেরিয়ে আসা আলোর বর্ণালী বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেন। নক্ষত্র সূর্য নিয়েই তার গবেষণা। তিনি দেখলেন সূর্যের আলোর বর্ণালী অবিরাম। এই অবিরাম বর্ণালীর মধ্যে অসংখ্য কালো রেখার সন্নিবেশ হয়েছে। 1811 সালে বিজ্ঞানী ফ্রনহফার গ্রেটিং যন্ত্রের সাহায্যে এই কালো রেখাগুলির সংখ্যা গণনা

করেন। তার নাম অনুসারে এই সব কালো রেখাগুলিকে ফ্রনহফার লাইন বলা হয়। সূর্যের পরিমণ্ডলে যেসব উত্তপ্ত মৌলিক পরমাণু আছে তাদের দ্বারা নির্দিষ্ট কিছু তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো শোষিত হবার ফলেই এই সব ফ্রনহফার লাইনের উৎপত্তি। আজ পর্যন্ত কয়েক হাজার এই রকম কালো রেখা নথীভুক্ত হয়েছে। পরীক্ষাগারে মৌলিক বস্তুর যে রৈখিক বর্ণালী সৃষ্টি করে তাদের সঙ্গেই এই রেখাগুলি মিলিয়ে সূর্যের ভেতরে প্রায় ষাটটির মতন মৌলিক বস্তুর সন্ধান পাওয়া গেছে।

সূর্যের মতই আর সকল নক্ষত্রদের মধ্যে থেকে যে আলো বেরিয়ে আসে তার বর্ণালীতে অবিরাম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ওপরে প্রতিস্থাপিত কালো রেখা পাওয়া যায়। নক্ষত্রের ভেতরের উষ্ণতা সূর্যের মতই খুব বেশি। এখানে পরমাণু, আয়ন পরস্পরের সঙ্গে তীব্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এসময়ে তারা নানান তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো নির্গত করে। সংঘর্ষের ফলে এসব তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোগুলি একে অপরের সঙ্গে মিলে যায়। ইংরাজীতে একে বলে কলিসন ব্রডনিং। নক্ষত্রের অস্বচ্ছ অংশ বা ফোটোস্ফিয়ার থেকে যে আলোর বিকিরণ বেরিয়ে আসে তার চরিত্রটি অবিরাম। এই অবিরাম তরঙ্গ রশ্মি যখন তুলনামূলক ঠাণ্ডা অংশ দিয়ে যায় তখন সেই জায়গার পরমাণুরা আপন আপন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তার মধ্যে থেকে শোষণ করে নেয়। এরই ফলে নক্ষত্রের বর্ণালীতে কালো রেখার সৃষ্টি হয়। নক্ষত্রের মধ্যে কি কি উপাদান আছে তা নক্ষত্রের বর্ণালীতে উপস্থিত কালো রেখাগুলি বর্ণালীবিদ্যায় ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করেই পাওয়া যায়।

নক্ষত্রের শোষিত বর্ণালী যখন প্রথম বিশ্লেষণ করা হলো তখন বোঝা গেল যে আকাশে যত নক্ষত্র আছে উপাদান অনুযায়ী তাদের কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে হারভার্ড শ্রেণীবিভাগটি প্রস্তাবিত হলো। কোন একটি বর্ণালীতে হাইড্রোজেনের কত রেখা উপস্থিত তার ওপরে নির্ভর করে এই শ্রেণীবিভাগ। 'A' শ্রেণীভুক্ত নক্ষত্রদের বর্ণালীতে হাইড্রোজেনের রেখার উপস্থিতি সবচেয়ে বেশি। এর পরের শ্রেণী হল 'B' এইভাবে চলতে থাকবে। এক সময়ে ভাবা হতো যে A, B ও অন্যান্য সকল শ্রেণীর নক্ষত্রদের মধ্যে হাইড্রোজেনের পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকবে। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে সকল নক্ষত্রের উপাদানই প্রায় সুষম এবং তা মোটামুটিভাবে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম দিয়ে তৈরি। নক্ষত্রদের বর্ণালীর মধ্যে যে তফাৎ আমরা দেখতে পাই তাদের ত্বকের তাপমাত্রা কম বেশি হওয়ার জন্য। এক এক শ্রেণীর নক্ষত্র, ত্বকের একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা নির্দেশ করে। O, B, A, F, G, K, M এই কয়টি অক্ষর দিয়ে আর এক ধরনের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। O শ্রেণীতে পাওয়া গেছে আয়নিত হিলিয়ামের বর্ণালী রেখা। B তে আয়নিত হিলিয়াম, A তে হাইড্রোজেন, F-এ আয়নিত ক্যালসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, লোহা, টাইটেনিয়াম, স্ট্রনসিয়াম, G ও K তে বহুবিধ ধাতু ও M-এ আণবিক টাইটেনিয়াম অক্সাইড প্রভৃতির বর্ণালীরেখা পাওয়া গেছে। শোষিত বর্ণালীতে রেখাগুলির আপাত ঔজ্জ্বল্যের বা রিলেটিভ ইনটেনসিটি থেকে নক্ষত্রের মধ্যে কোন বস্তু কি পরিমাণ আছে তার সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। উষ্ণতা ও উপাদানের পরিমাণ থেকে তাত্ত্বিক ভাবে বর্ণালীর একটি চরিত্র খাড়া করা যায়। তাত্ত্বিকভাবে লব্ধ বর্ণালী, পরীক্ষালব্ধ বর্ণালীর সঙ্গে তুলনা করে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছুনো সম্ভব। বর্ণালীবিদ্যার সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে আসা গেছে যে একটি স্বাভাবিক নক্ষত্রে শতকরা সত্তর ভাগ হাইড্রোজেন, সাতাশ ভাগ হিলিয়াম, দুই ভাগ কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও নিয়ন। বাকী একভাগ হচ্ছে সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, এ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন, ক্যালসিয়াম, লোহা প্রভৃতি।

দেখা গেল আকাশের তারারা তাদের প্রাণমন প্রকাশ করছে আলোর লীলাময় ছন্দে। সেই ছন্দের স্বরূপটি কাজে ল্যাগিয়ে বিজ্ঞানীরা তাদের অন্তরের কথাগুলো পড়ে নিচ্ছেন বর্ণালী-বিদ্যার সাহায্যে।

10 ল্যান্সডাউন রোড, কলকাতা-29

পুজো সংখ্যায়

নির্বাচিত প্রবন্ধ গুচ্ছ

প্রযুক্তি ও কারিগরী বিদ্যা

লিখবেন

সিদ্ধার্থ রায় ॥ সুর্যেন্দু বিকাশ কর মহাপাত্র ॥ মৃন্ময়ী দাশ ॥ বিমান বসু ॥ সুবীর দত্ত ॥ আশিস দাস ॥ জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ আবদুল্লাহ' আলমুতী ॥ শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় ॥ এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ও আরও অনেকে

বেরোবে মহালয়ার অনেক আগেই

যদি বাতাস না থাকতো

নিত্যগোপাল বসু

সূর্যের অনেকগুলো গ্রহের মতো পৃথিবীতেও যদি বাতাস না থাকতো? পৃথিবীর দুই নিকট প্রতিবেশী—চাঁদ ও বুধের পরিমণ্ডলে কোনো বাতাস নেই। মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব আমাদের চেয়ে কম। আবার শুক্রে বায়ুমণ্ডল আছে। অবশ্য তার ঘনত্ব আমাদের বায়ুমণ্ডলের অনেকগুণ বেশি।

বাতাস হল মোটামুটিভাবে 78%নাইট্রোজেন, 21% অক্সিজেন, 0·09% আর্গন ও অন্যান্য নিষ্ক্রিয় গ্যাস; 0·03% কার্বন-ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প, ধুলো-বালি, রেণুকণায় মিশ্রণ। এইসব পদার্থের অনুপাত বিভিন্ন জায়গায় এবং একই জায়গায় বিভিন্ন সময়ে আলাদা আলাদা রকমের। বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত বিভিন্ন কণার সূর্যালোক শোষণ ও বিক্ষেপণে আমাদের পরিবেশকে কখনো বা শান্ত কিংবা ভয়ংকর করে তোলে, অথবা সুন্দর আলো-ছায়ার সৃষ্টি হয়। যেমন, আকাশনীল দেখায় আলোর বিক্ষেপণে। সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের বর্ণসুষমা, বর্ষার বজ্রনির্ঘোষ ও বিদ্যুৎবহ্নি; মেরুপ্রভার অলৌকিক ছটা—এসব কিছু সৃষ্টির জন্য দায়ী বায়ুমণ্ডল। অলীক-মরীচিকা তো সৃষ্টি হয় বায়ুস্তরের তাপমাত্রার পরিবর্তনে—তাদের ঘনত্বের বিভিন্নতার জন্য বাতাসে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘূর্ণনের (airturbulence) জন্য রাত্রির আকাশে তারারা মিটমিট হাসে। বাতাস আছে বলেই, মনে হয় আকাশ গামলার মতো পৃথিবীর দিক চক্রবাল ছুঁয়েছে।

বাতাস ছাড়া পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব থাকতো না। কেননা শক্তি উৎপাদনের প্রয়োজনে প্রাণিকোষ অক্সিজেন গ্রহণ করে। শ্বসন-ক্রিয়ায় পরিমণ্ডলে আবার কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস ফিরিয়ে দেয়। এমনকি যেসব প্রাণী জলে বেঁচে থাকে তারাও পরোক্ষভাবে বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনের

ওপর নির্ভর করে। বাতাসের অক্সিজেন জলতলে দ্রবীভূত হয় ও ব্যপন প্রক্রিয়ায় জলের অক্সিজেনের পরিমাণ নির্ধারণ করে। আগুন জ্বালাতে শেখা আমাদের সভ্যতার প্রাচীনতম প্রধান আবিষ্কার। একমাত্র অক্সিজেনের সংস্পর্শে কার্বন ও হাইড্রো কার্বনের দহন সম্ভব। তাপশক্তি ছাড়া পৃথিবীতে শিল্প-কলকারাখানা-পরিবহন কখনোই সম্ভব হতো না। বাতাসের অক্সিজেন ব্যতিরেকে আমাদের জীবন-ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়তো মুহূর্তেই। বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস থেকেই উদ্ভিদ-কুল আমাদের নিত্য-প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্ত্র-বাসস্থানের উপাদান, কাঠ, ওষুধ প্রভৃতির যোগান দিয়ে আসছে।

বাতাসেসবচেয়ে বেশি আছে নাইট্রোজেন গ্যাস। অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় বলে বাতাসের অক্সিজেনকে লঘুকৃত করে। নচেৎ হয়তো পৃথিবীর সবকিছু জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যেত। আবার এই নাইট্রোজেন প্রোটিন-খাদ্যের অন্যতম প্রধান উপাদান। প্রকৃতিতে কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়া ঐ গ্যাসীয় নাইট্রোজেনকে নাইট্রোজেন যৌগতে রূপান্তরিত করতে পারে। উদ্ভিদ ঐ যৌগকে কাজে লাগায়। বিদ্যুৎ-চমকে কিছু নাইট্রোজেন বৃষ্টি ধারায় নেমে আসে মাটিতে। প্রাণীরা তাদের প্রয়োজনীয় প্রোটিন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই উদ্ভিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে থাকে।

পৃথিবীর ঊর্ধ্বাকাশে—ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় বিশ কিলোমিটার ওপরে সূর্যের অতি বেগুনী রশ্মির প্রভাবে অক্সিজেন থেকে তৈরি হয় ওজোন-গ্যাস (ozone-gas) ঐ ওজোন গ্যাস স্তর পৃথিবীর তাবত প্রাণী ও উদ্ভিদকুলকে প্রাণঘাতী অতিবেগুনী রশ্মির হাত থেকে বাঁচায়। ওজোন-স্তর ছাড়া পৃথিবী পৃষ্ঠে হয়তো প্রাণের উদ্ভব হতো না। প্রাণিদেহে চামড়ার ক্যানসার বৃদ্ধি পেত, আমাদের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হতো।

বায়ুমণ্ডলে সর্বদা জলীয় বাষ্প আছে। তাই আমাদের শ্বাসনালী শ্বাস-প্রশ্বাস কালে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় না। জলীয় বাষ্পের অবর্তমানে শ্বাসনালী শুকিয়ে যেত—আমাদের নাক দিয়ে রক্ত পড়তো। আর নাক শুকনো থাকতো বলেই—আমরা কোনো জিনিসের গন্ধ শুকতে পারতাম না। সূর্যের তাপে জল বাষ্পীভূত হয়। ঐ বাষ্প ঠাণ্ডা হয়ে মেঘ তৈরি হয়। বাতাসে যদি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ধূলিকণা না থাকতো তবে মেঘ তৈরি হতে পারতো না। ফলে বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, তুষার পাত সম্ভব হতো না। সাধারণতঃ বৃষ্টির জল পৃথিবী-পৃষ্ঠের ফাটল চুঁইয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। পরে তা ঠাণ্ডায় আয়তনে বেড়ে গিয়ে পাথর ভেঙে গুঁড়িয়েছে—পাথর থেকে তৈরি হয়েছে নুড়ি। দীর্ঘদিন ধরে অশ্রান্ত ভাবে বৃষ্টির জল ঝর্ণা নদীর ধারা হিসাবে ঐ নুড়ি বয়ে নিয়ে যাবার সময় ভাঙতে ভাঙতে সৃষ্টি করেছে মৃত্তিকা। আর মাটি না থাকলে কি গাছপালা জন্মাতো? সূর্যের আলো মেঘের জলকণার মধ্য দিয়ে যাবার সময় বিচ্ছুরিত হয়—সৃষ্টি হয় চোখ জুড়োনো রংধনু (Rain-bow)। জলীয় বাষ্প ছাড়া কুয়াশা দেখা দিত না। ঘাসের ডগায় শিশির পড়তো না, সূর্য বা চাঁদের চতুর্দিক জলবৃত্ত (Halo) দেখা যেত না।

হঠাৎ যদি কোন কারণে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল উধাও হয়ে যেত? পৃথিবী থেকে মুহূর্তের মধ্যে প্রাণের কলরব নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত! সমস্ত সাগর সমুদ্র-হ্রদের জল বাষ্পীভূত হয়ে শুকিয়ে যেতো। যেহেতু জলীয়-বাষ্প বাতাসের চেয়ে ভারী তা পৃথিবীর চারদিকে নতুন আচ্ছাদন তৈরি করতো। সেই নতুন পরিমণ্ডল হতো সাঁৎসাঁ্যাতে ও বর্ষা-মুখর—যা কিনা পৃথিবী-পৃষ্ঠ ক্ষয় করে ফেলতো ভয়ংকর ভাবে।

যে বায়ু সমুদ্রে আমরা বাস করি তা কিন্তু নিয়তঃ চলমান। এই গতির কারণ হল প্রতিনিয়ত বায়ু মণ্ডলের তাপ ও চাপের পরিবর্তন ও পৃথিবীর আবর্তন। বায়ু প্রবাহ মরু-অঞ্চলের বালিতে ঢেউ-এর নক্সা আঁকে, সমুদ্রে তোলে বিশাল ঢেউ। বাতাস ছাড়া পালতোলা নৌকো বা জাহাজ কিংবা বায়ুকলের অস্তিত্ব থাকতোই না। বাতাস ছাড়া বায়ু-পরাগী উদ্ভিদের পরাগ-সংযোগ হতো না। বায়ুমণ্ডলের অনুপস্থিতিতে পাখি নীল আকাশে ডানা মেলে উধাও হতো না; বেলুন, হেলিকপ্টার বা বিমানপোতের আবিষ্কার হতো না। অবশ্য সেই বায়ুবিহীন পরিবেশে উড়তে সক্ষম হতো রকেট। বাতাস আমাদের চারদিকে চাদরের মতো আবরণ সৃষ্টি করে রেখেছে। তাই সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপেও টিঁকে থাকি। বাতাস তাপের কু-পরিবাহী বলে রাত্রে সূর্যের অবর্তমানে ঠাণ্ডায় জমে যাই না। দিন ও রাতের তাপমাত্রার পার্থক্য খুব একটা বেশি হতে পারে না। বাতাসের সাথে ঘর্ষণে উল্কা পৃথিবীতে আছড়ে পড়ার আগেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বাতাস না থাকলে চন্দ্রপৃষ্ঠের মতো পৃথিবীতল উল্কাপাতে ঝাঁঝরা হয়ে যেতো——পাহাড়গুলোর সূঁচোলো চূড়ো যেত গুঁড়িয়ে।

বাতাস না থাকলে আমাদের পক্ষে কথা বলা বা শোনা সম্ভব হতো না। কেননা শব্দ তো বয়ে চলে বাতাসে। বাতাস-বিনা আমাদের প্রাত্যহিক বেশির ভাগ কাজ অসম্ভব হতো।

পৃথিবী পৃষ্ঠের প্রায় 80 কিলোমিটার ওপরে আছে আয়নমণ্ডল, যা কিনা রেডিও তরঙ্গকে প্রতিফলিত করে বলেই—দূর-দূরান্তরে বেতার প্রেরণ সম্ভব হয়। অবশ্য আয়নমণ্ডলের অবর্তমানে কৃত্রিম উপগ্রহকে কাজে লাগিয়েও বেতার প্রেরণ সম্ভব হতো। কিন্তু সেই কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরি করতো কে, বা সেই বেতার অনুষ্ঠান শুনতোই বা কে? বাতাস না থাকলে বুধ, শুক্র বা মঙ্গলের মতো আমাদের এই সবুজ পৃথিবীতে মানুষের প্রাণ-চাঞ্চল্য থাকতো না।

উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ।

অ্যাপোলোনিয়াস উপপাদ্য ও 'জাদু' বর্গ

গোপাল চক্রবর্তী

যে কোনো ত্রিভুজের যে কোনো শীর্ষবিন্দু ও এর বিপরীত বাহুর মধ্যবিন্দু সংযোজক সরলরেখাটিকে ঐ বাহুর মধ্যমা বলা হয়।

মনে করা যাক, $\triangle ABC$ এর BC বাহুর মধ্যমা AD।

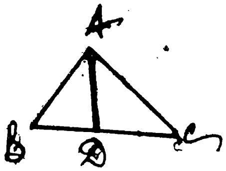

অ্যাপোলোনিয়াস উপপাদ্য অনুযায়ী

$$AB^2 + AC^2 = 2(BD^2 + AD^2) = 2(\tfrac{1}{4}BC^2 + AD^2) = 2\{(\tfrac{1}{2}BC)^2 + AD^2\}$$

নিচের ত্রিভুজ ABC-র তিনটি ভুজ বা বাহুর উপর তিনটি এবং পাশে AD মধ্যমার সমান মাপের বাহু বিশিষ্ট আর একটি, অর্থাৎ মোট চারটি তিন ঘরের বর্গক্ষেত্র আঁকা হয়েছে। বর্গক্ষেত্রের সবগুলির মধ্যেই এমন ভাবে সংখ্যা বসানো আছে যাতে

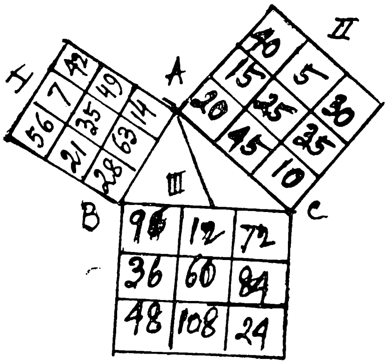

A

8	1	6
3	5	7
4	9	2

D

(i) প্রত্যেকটি বর্গের সংখ্যাগুলিকে ওপর নিচ, পাশাপাশি বা কোনাকুনি যেভাবেই যোগ করা যাক না কেন যোগফল একই থাকবে; AB বাহুর ওপর বর্গের বেলায় হবে 105, AC বাহুর বেলায় হবে 75, BC বাহুর বেলায় 180 এবং AD মধ্যমার বেলায় হবে 15।

(ii) বর্গগুলির মধ্যে লেখা সংখ্যার যোগফল অ্যাপোলোনিয়াস উপপাদ্যের নিয়ম মানবে; এক্ষেত্রে

$$315^2 + 225^2 = 2\{(\tfrac{1}{2} \times 540)^2 + 45^2\}$$

বা, $99225 + 50625 = 2(72900 + 2025)$

বা, $149850 = 2 \times 74925$

বা, $149850 = 149850$

(iii) এমন কি, বর্গ চারটির যে কোন বিশেষ ঘরের সংখ্যাও অ্যাপোলোনিয়াসের নিয়ম মেনে চলবে:

যেমন, $21^2 + 15^2 = 2\{(\tfrac{1}{2} \times 36)^2\}$

অথবা, $42^2 + 30^2 = 2\{(\tfrac{1}{2} \times 72)^2 + 6^2\}$

কিংবা, $63^2 + 49^2 = 2\{(\tfrac{1}{2} \times 108)^2 + 9^2\}$ ইত্যাদি।

প্রশ্ন উঠতে পারে, বর্গগুলি তিন ঘরা না হয়ে যদি চারঘরা বা পাঁচঘরা হয় তাহলেও কি 'জাদু' বর্গ তৈরি করা সম্ভব?

নিচের ত্রিভুজের ওপর চারঘরা 'জাদু' বর্গ আঁকা হয়েছে—যা আগের (i), (ii) ও (iii) নিয়ম সুন্দর ভাবে মানছে।

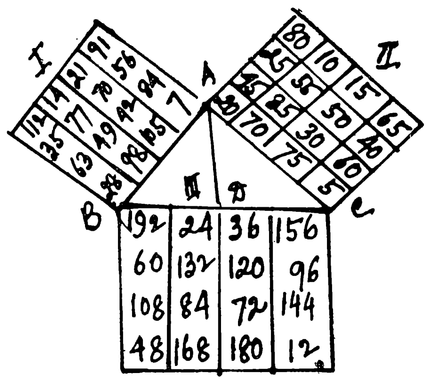

IV

A

16	2	3	13
5	11	10	8
9	7	6	12
4	14	15	1

D

উৎসাহী কেউ যদি পাঁচ, ছয় বা ততোধিক ঘরের অন্য সংখ্যা বিশিষ্ট 'জাদু'বর্গ তৈরি করে পাঠান তার জন্য সমাধান সূত্র:

$$m^2 + (m+2)^2 = 2[\{\tfrac{1}{2}(2m+2)\}^2 + 1^2]$$

যেখানে, $m = 1, 2, 3 \cdots$ ইত্যাদি।

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, নেতাজী সুভাষ রোড, কল 1

কৃতী বিজ্ঞানী প্রফেসর নীলরতন ধর

ছন্দোময় মণ্ডল

প্রফেসর নীলরতন ধর বিজ্ঞান জগতে এক সুপরিচিত ব্যক্তি। তাঁর জন্ম হয় 1892 খ্রীস্টাব্দের 2রা জানুয়ারী বাংলাদেশের যশোহর শহরে। পিতা প্রসন্নকুমার ধর ছিলেন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁর মাতার নাম নীরোদমোহিনী দেবী।

শিশুকাল থেকেই তাঁর লেখাপড়ায় অবহেলা ছিল না। অজানাকে জানবার, অচেনাকে চিনবার কৌতূহল ছিল অপরিসীম। তিনি যশোহর জেলা স্কুল থেকে 1907 খ্রীস্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে পনের টাকা বৃত্তিলাভ করেন। প্রাক্-স্নাতক পরীক্ষায়ও তিনি কুড়ি টাকা বৃত্তি পেয়েছিলেন রিপন কলেজের (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজের) ছাত্র হিসাবে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে। এরপর তিনি যান প্রেসিডেন্সী কলেজে। অনার্স সহ বি. এসসি ও এম. এসসি উভয় পরীক্ষাতেই তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করেন। এসময়েই তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্র ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে শিক্ষক হিসাবে পান এবং তাঁদের আদর্শ উত্তরাধিকারী হিসাবে গড়ে ওঠেন। তিনি বি. এসসি-তে বত্রিশ টাকা বৃত্তি পান এবং এম. এসসিতে পান দশটি সুবর্ণ পদক এবং পাঁচশত টাকা। সেই বছরই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ রসায়ন বিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 1914 খ্রীস্টাব্দে পান গ্রিফিথ স্মারক ও এলিয়ট পুরস্কার। 1915 সালে তিনি বিলেত যাত্রা করেন ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে। 1917 এবং 1919 সালে পদার্থ রসায়নে ডি. এসসি. উপাধি পান লণ্ডন ও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

লণ্ডনের বোর্ড অব এড্যুকেশন-এর বিশেষ অনুরোধ তিনি ইণ্ডিয়ান এড্যুকেশনাল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত হন। আই. ই. এস. হিসাবে তাঁর কর্মস্থল ছিল এলাহাবাদ। 1919 সালে সেখানকার মুইর সেণ্ট্রাল কলেজে পদার্থ রসায়নবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে কলেজ থেকে যান বিশ্ববিদ্যালয়ে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের বিভাগীয় প্রধান ও সায়েন্স ফ্যাকাল্টির ডীন হিসাবে ডঃ ধর যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দেন। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি অধ্যাপনা করেছিলেন।

নীলরতন ধর ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রসায়ন শাখার, ভারতবর্ষের মৃৎ বিজ্ঞানী সমিতির এবং ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। 1964 সালে তিনি বিজ্ঞান কংগ্রেসের রুড়কী অধিবেশনের মূল সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ফরাসী বিজ্ঞান আকাদেমীর ও ফরাসী কৃষি আকাদেমীর বিদেশী সদস্য হিসাবে ডঃ ধর নির্বাচিত হয়েছিলেন।

1944 সালে নীলরতন ধর উত্তর প্রদেশের শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর নিযুক্ত হন। সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর যাবৎ তিনি ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। রসায়নে নোবেল প্রাপক নির্বাচনের উদ্দেশ্যে গঠিত আন্তর্জাতিক কমিটির সদস্য হন 1937 এবং 1948 সালে। এছাড়া বেশ কয়েকবার সুইডিশ আকাদেমীর সভ্য অধ্যাপক, আইসল্যাণ্ডের ও রাশিয়ার বিজ্ঞান আকাদেমীর কৃষি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক কোভদা ওঁর নাম নোবেল প্রাইজ দেবার জন্য প্রস্তাব করেছিলেন।

1937 সালে তিনি আন্তর্জাতিক কৃষি কংগ্রেসের সদস্য হন। ঐ বছর থেকেই তিনি বাঙ্গালোরের সায়েন্স ইন্সটিটিউটের গভর্নিং বডির সদস্যও ছিলেন। ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি, ন্যাশনাল আকাদেমী অফ সায়েন্স এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সেরও প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিলেন। 1932 থেকে 1934 খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

তিনি বিশ্বভারতী থেকে দেশিকোত্তম এবং বারাণসী, কলকাতা, যাদবপুর, গোরক্ষপুর প্রভৃতি থেকে সাম্মানিক ডি. এস.-সি উপাধি পান। উল্লেখ্য যে কল্যাণীর দুটি বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও এই সাম্মানিক ডি. এসসি. উপাধি পেয়েছিলেন।

তাঁর প্রতিষ্ঠিত গবেষণাগার তাঁর প্রথমা পত্নী শীলা ধরের নামে নামাঙ্কিত হয়েছে। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল খাদ্য, কৃষি ও নাইট্রোজেন। 'আমাদের খাদ্য', 'নিউ কনসেপশান অব বায়োকেমিস্ট্রি' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক।

দুঃখের বিষয়, তিনি সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। ভারতীয় বিজ্ঞান সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট, আচার্য জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের আদর্শ উত্তরাধিকারী, ডঃ ধরের মহাপ্রয়াণে ভারতবর্ষের তথা বিশ্বের বিজ্ঞানজগতের এক অপরিসীম শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, যা কোনদিন পূর্ণ হবার নয়।

বি-15/77, লেক প্লেস, কল্যাণী (741 235) নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ—741235

বুদ্ধি শুদ্ধি

লেখা ও ছবি : সমীর মণ্ডল

খাম খুলবে সাবধানে

চিঠি পেতে কার না ভাল লাগে। তাতে যদি চিঠি আসে খামে। খাম খোলাতেই আদ্দেক আনন্দ। আমি ত খুব সাবধানে খাম খুলি। কি পাব, কি পাব-একটা উত্তেজনা। একটা ছোট্ট আবিষ্কারের মত নয় কি? কিন্তু তোমাকে ধরো একটা আঠা দিয়ে আঁটা খাম ধরিয়ে দিয়ে ভিতরে কী আছে সব বলে দিলাম, তাহলে? মজাটাই মাটি আর আঁটকাবার দরকারই বা কী? কিন্তু বলে দিয়েও মজা করা যায়। আমি তোমাকে আঁটকানো খামই দেব তিনখানা। বলেও দেব ভিতরে কী আছে। অথচ মজাটা ষোলআনাই থাকবে।

তিনটি একই রকম খাম তোমার সামনে। একটার ওপরে লেখা 10, একটার ওপর 15 আর একটাতে 20। প্রতিটি খামের মধ্যে আছে দুটি করে খাম। তাতে কিছু লেখা নেই। কিন্তু ঐ একজোড়া করে খামের প্রত্যেকটির মধ্যে আছে একটি করে নোট। কত টাকার নোট আছে বলছি। এক জোড়ার মধ্যে দুটি খামেই একটি করে পাঁচ টাকার নোট। আর এক জোড়ার মধ্যে দুটি খামেই একটি করে দশটাকার নোট। অন্য জোড়ার একটিতে দশ টাকার নোট আর একটিতে পাঁচ টাকার নোট। তোমার সামনে তিনটি খামের মধ্যে 10 টাকা, 15 টাকা এবং 20 টাকা আছে। ধাঁধা যেটা সেটা হল খামের ওপর 10, 15, 20 লেখাগুলোর সবগুলোই ভুল, ভেতরের টাকার সঙ্গে মিল নেই। তোমাকে সুযোগ দেওয়া হল একটি খাম খোলার এবং তার ভিতরের আর একটি খাম খুলে একটি মাত্র নোট দেখার। তুমি কী বলতে পারো কোন খামে কি কি নোট আছে? এখন তুমি কোন খামটা খুলবে?

উত্তরটা আগামী সংখ্যায় মিলিয়ে নিও।

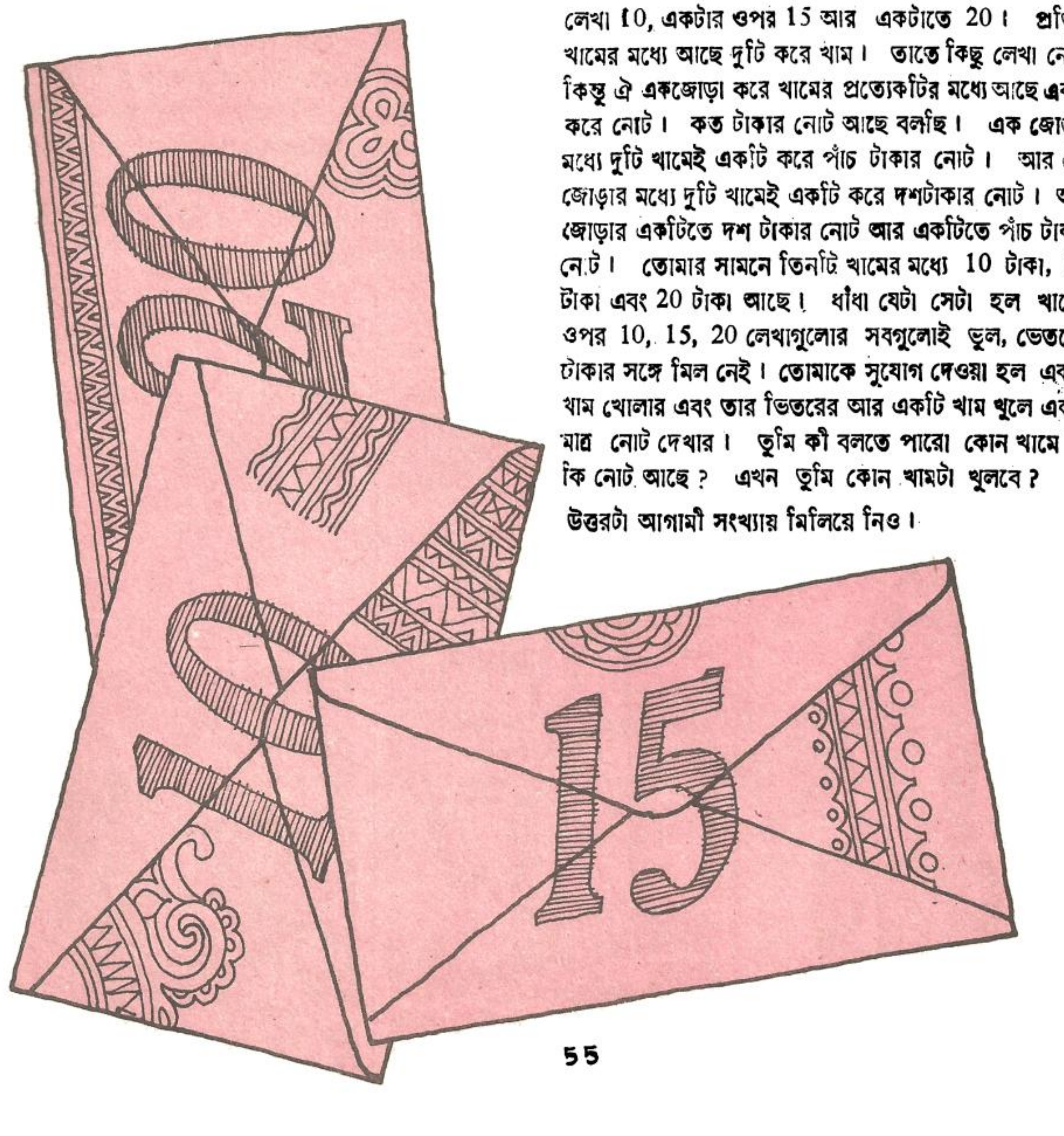

ক্যুইজ কনটেস্ট

গ্রেড I

VII-VIII আগস্ট '87

1. নার্ভ কলার কাজ কি?

2. বাদুড়ের লেজ আছে কি?

(ক) হ্যাঁ (খ) নাই

3. আর্যদের জলের দেবতার নাম কি ছিল?

4. সোমবারের ইংরেজী নাম 'মানডে' হলো কি ভাবে?

5. 'মহম্মদ বিন তুঘলক' কোন্ বংশের সুলতান ছিলেন?

6. 'নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস'এর প্রথম সভাপতি কে ছিলেন?

7. কোন্ বছর 'থঙ্গরাজ' ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাবের অধিনায়ক ছিলেন?

8. অবিশুদ্ধ হীরক কোন্ নামে পরিচিত?

9. গীত শেঠি কোন্ খেলার জন্য বিখ্যাত?

10. এই বিদেশী মাছটির নাম SEA BASS—এটি মিঠা না নোনা জলের মাছ?

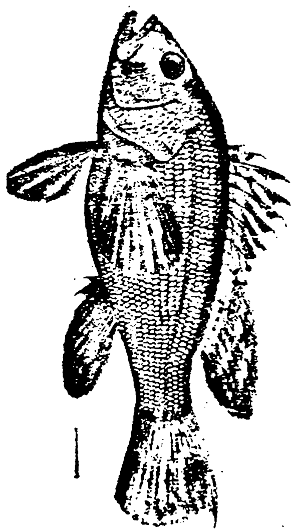

গ্রেড II

IX-X আগস্ট 87

1. মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর কোন্ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন?

2. বিশ্বের বৃহত্তম লিখিত সংবিধান কোন্‌টি?

3. 'ক্যাটাবেটিক বায়ু' কাকে বলে?

4. কোন শ্বসনে আংশিক শক্তি নির্গত হয়?

5. প্রতিটি লোহিত রক্ত কণিকার গড় আয়ুষ্কাল কতো?

6. এক ফার্লং = কতো গজ?

7. ডায়নামো যন্ত্রে শক্তির কেমনতর রূপান্তর ঘটে?

8. বিশ্বের প্রথম হকি ক্লাবের নাম কি?

9. নিচের কোন্‌টি ক্ষুদ্রতম?

(ক) $0{\cdot}81$ (খ) $(0,9)^2$

(গ) $\sqrt{0.6561}$ (ঘ) $\frac{37}{46}$

10. ছবিটি কোন্ দেশের স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন?

গ্রেড III

XI-XII আগস্ট '87

1. প্রাণিবিজ্ঞানে ছারপোকার বিজ্ঞানসম্মত নাম কি?

2. সিরিজটি সম্পূর্ণ কর : 254, 227. 203, 182, 164, ( )

(ক) 142 (খ) 148 (গ) 149

3. 1990 খ্রীস্টাব্দে এশিয়ান গেমস কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?

(ক) ব্যাংকক্ (খ) বেজিং (গ) ম্যানিলা

4. বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোত্তম সম্মানের নাম কি?

5. একজন বিখ্যাত ভারতীয় মনীষীর জন্মদিন জানুয়ারী 12, ভারতের সর্বত্র প্রতি বছর জাতীয় যুব দিবসরূপে পালিত হয়। – ঐ ভারতীয় মনীষীর নাম কি?

6. কোন্ হর্মোন রক্ত চাপকে নিয়ন্ত্রিত করে?

7. ALOPECIA কি?

8. N. B. O. কি? কতো সালে এটি স্থাপিত হয়?

9. ভারতীয় বিমান বাহিনী MIG-21 বিমানকে অপর কি নামে অভিহিত করেন?

10. এটি রংচঙে কোন ফুল নয়, একটি খনিজ।—খনিজটির নাম কি?

শব্দকূট

সুজন কুমার দাস

সংকেত—পাশাপাশি

1. বৈদ্যুতিক প্রবাহ অ্যাম্পিয়ার এককে মাপতে যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় 3. যে যন্ত্রের সাহায্যে ভিন্ন স্থানে অবস্থিত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে কথোপকথন হয়। 6. শ্রীহরি কোটা থেকে উৎক্ষিপ্ত ভারতের প্রথম উপগ্রহ। 7. হৃদপিণ্ডের মধ্যে রক্তের প্রবাহ আছে কিনা জানার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র। 8. রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় গ্যাসের আয়তন পরিবর্তন যে যন্ত্রের সাহায্যে মাপা যায়। 9. জগদীশ চন্দ্র আবিষ্কৃত মাছের বৃদ্ধি মাপার যন্ত্র। 11. যে যন্ত্রের সাহায্যে বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে এরোপ্লেনের গতিবিধি লক্ষ্য করা যায়। 15. চলবার সময় গাড়ির চাকার অতিক্রান্ত পথ মাপা হয় যে যন্ত্রের দ্বারা 16. মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারক। **সংকেত—উপরনিচ**

2. 'Raman effect' এর জন্য যিনি নোবেল পুরস্কার পান। 3. বৈজ্ঞানিক Bell কর্তৃক আবিষ্কৃত 10 জুলাই 1962 তারিখে Cape Kenedy থেকে উৎক্ষিপ্ত একটি Space Communication Satellite. 4. যে যন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবী থেকে সূর্যের তাপমাত্রা মাপা যায়। 5. বায়ু প্রবাহের গতিবেগ যে যন্ত্রের সাহায্যে মাপা যায়। 7. মানুষের হৃদপিণ্ডে রক্তপ্রবাহের গতি নির্ণয়ের যন্ত্র। 10. পেষণ করার যন্ত্র। 12. বিনা তারে বার্তা প্রেরণ যন্ত্র। 13. ফটোগ্রাফি ফিল্মের আবিষ্কারক 14. পদার্থ গঠনের একটি মূল কণিকা

সমাধান আগামী সংখ্যায়

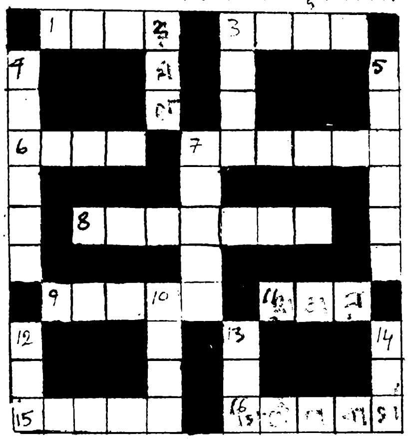

আই কিউ টেস্ট আগস্ট '87

1. একটি বাক্সের সব সময়ই থাকবে—
(a) কোণ, (b) আকার, (c) কাঠ, (d) দড়ি।
2. যদি 653042 সংখ্যাটি দিয়ে Volume শব্দটি বোঝায়, তাহলে 4032 সংখ্যাটি দিয়ে কোন সংখ্যাটি বোঝাবে—
(a) Mleu, (b) Mule, (c) Melu, (d) Mlue, (e) Meul.
3. সমকোণী ত্রিভুজের বাহুগুলির অনুপাত—
(a) 6 : 4 : 3, (b) 13 : 12 : 5, (c) 6 : 5 : 4, (d) এদের কোনটিই নয়।
4. ট্রানজিস্টরের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কোনটি—
(a) রূপা, (b) জার্মেনিয়াম, (c) অসমিয়াম, (d) অ্যালুমিনিয়াম।
5. বর্ণের ঔজ্জ্বল্য পরিমাপক যন্ত্রের নাম কি—
(a) ক্রোমোমিটার, (b) টেনাসিমিটার, (c) হিপসো মিটার

আই কিউ টেস্ট সমাধান

আই-কিউ-টেস্ট / জুন 1987-এর সমাধান

1. (b) রাম। 2. (c) দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি। 3. (d) তড়িৎ লেপন। 4. (a) পিগ আয়রন। 5. (b) পাঞ্জাব।

কুইজ কনটেস্ট সমাধান

জুন 1987 কুইজ কনটেস্ট গ্রেড I-এর সমাধান

1. হুইস্কার। 2. বিখ্যাত কূটনীতিবিদ রূপে। 3. কনস্ট্যান্টিনোপল। 5. বাস্তালোকের উৎপত্তি হয়। 5. কমে। 6. তিনটি। 7. ইরান। 8. Federation International de Football Association. 9. 1·68 মিটার চওড়া। 10. ক্যাকটাস উদ্ভিদ ও তার ফুল।

জুন 1987 কুইজ কনটেস্ট গ্রেড 2-এর সমাধান

1. বিষ্ণুভক্ত রাজা সূর্যবর্মণ। 2. প্রতি ঘণ্টায় প্রায় এক লক্ষ কিলোমিটারের কিছু বেশি। 3. অবাত শ্বসন। 4. রক্তাল্পতা রোগ। 5. ত্বরণ। 6. 746 ওয়াট। 7. রোধাঙ্কের একক। 8. MgO. 9. ডেলটয়েড অঞ্চল। 10. COMMON GRUNT.

জুন 1987 কুইজ কনটেস্ট গ্রেড 3-এর সমাধান

1. নাইক্রোম। 2. পাট উৎপন্ন হয়। 3. CANIS FAMILIARIS. 4 একটি। 5. দুটি ক্রোমোজোমে একই গুণবাহী জিন থাকলে সেই জীবকে বলে হোমোজাইগাস অর্থাৎ সদৃশ জিনযুক্ত জীব। 6. ল অফ সেগ্রিগেশান অর্থাৎ পৃথকীকরণ সূত্র। . প্যানক্রিয়াস। 8. 14·0 মিনিট। 9. ইনফ্রারেড রশ্মি। 10 F. A. KEKULE.

শব্দকূট সমাধান

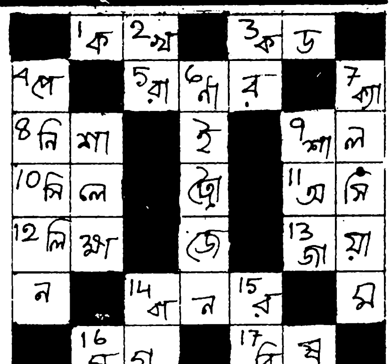

ফ্রিজ

বেশ গরম পড়েছে কয়েকদিন হল। রোদ্দুরের কড়া তেজ, গলা শুকিয়ে কাঠ। যখন তখন ফ্রিজ খুলে ঢকঢক করে ঠাণ্ডা জল খাচ্ছে জিজা। আর বাবলি বৌদি, মানে, ওর মা বকাঝকা করছেন ওকে, রোদ থেকে এসে ঠাণ্ডা জল খেলে অসুখ করবে বলে।

জিজা এসে আমায় জিজ্ঞেস করল 'আচ্ছা কাকু, ফ্রিজের জল খেলে অসুখ করে বুঝি?' দেখলাম ঘোর বিপত্তি। কথা ঘোরানোর জন্য বললাম 'ফ্রিজের জল খেলে অসুখ করে কিনা সেটা অন্য কথা। তবে, একটা অসুখই হল ফ্রিজ তৈরির গোড়ার কথা।

1838। ফ্লোরিডায় এক ডাক্তার ছিলেন জন গোরি। তখন ফ্লোরিডায় ম্যালেরিয়ার রুগীরা গরমে খুব কষ্ট পাচ্ছিল। তাদের জন্য কি করা যায়—এই নিয়ে ভাবতে ভাবতে গোরি সাহেব এমন একটা মেশিন তৈরি করে ফেললেন যার সাহায্যে জলকে বরফ করে ফেলা যায়।

রেফ্রিজেরেটরে একরকম ইলেকট্রিক মোটর আছে—তার সাহায্যে প্রেসার দিয়ে ক্রেয়ন গ্যাসকে তরল করা যায়। তখন সেই তরল জিনিসটা টিউবের ভেতর দিয়ে গিয়ে আবার গ্যাস হয়ে যায়, তখন প্রেসারটা আর কাজ করে না। তরল থেকে গ্যাস করতে হলে কিছুটা উত্তাপ দরকার। রেফ্রিজেরেটরের তলায় কতগুলি পাখা লাগানো আছে—তার সাহায্যে উত্তাপটাকে কমিয়ে দেওয়া যায়। এই হল রেফ্রিজারেটরের গপ্প।

জিজা একটা ক্লান্তির শ্বাস ফেলে বলল, 'দাঁড়াও বাবা, একটু জল খেয়ে আসি, গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।' আমি তো শুনে তাজ্জব। 'সে কিরে! বকে মরলাম আমি, তোর গলা কাঠ হল কি করে?' পাকা বুড়ির মতো জিজা বলল 'অত ঘুরিয়ে বলার কি আছে? বললেই হয় আমাকেও এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল দে। তবে দেখো কাকু, মা বকলে কিন্তু তোমায় দেখিয়ে দেব।'

অলয় ঘোষাল ও ঋতুপর্ণ ঘোষ

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ

মে সংখ্যায় প্রকাশিত কুইজ কনটেস্ট গ্রেড-I-এর 10নং প্রশ্নের উত্তর নন্দলাল বসুর পরিবর্তে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর পড়তে হবে। এই মুদ্রণপ্রমাদের জন্য আমরা দুঃখিত। নতুন করে যে কুইজ কনটেস্ট গ্রেড I, II, III-এর প্রবর্তন করা হয়েছে এ সম্পর্কে তোমাদের অভিমত আগেই জানতে চাওয়া হয়েছে। অনেকেই নতুন পদ্ধতিতে খুশী। আবার কেউ কেউ নতুন করে ফটো কুইজ প্রবর্তনের কথাও জানিয়েছো।

বিভিন্ন প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণকারীদের প্রতি বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে—তারা যেন 'বলতে পারো কেন' 'চিঠিপত্র' বা প্রতিযোগিতার উত্তর একই খামে না পাঠান। বিভিন্ন বিষয়ের শিরোনাম অবশ্যই খামের ওপরে লেখা থাকা দরকার। বার্ষিক অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত সফল প্রতিযোগীদের মধ্যে যারা অনুরোধ করেছে তাদের সার্টিফিকেট সমূহ আরও একমাস (31 আগস্ট '87) দপ্তরে রাখা হবে। বাকী সকলের সার্টিফিকেট ও পুরস্কার আণ্ডার সার্টিফিকেট অব পোস্টিং-এ পাঠানো হচ্ছে।

পরিচালক
কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ

সফল উত্তরদাতাদের নাম

জুন '87-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড I এর সর্বাধিক নয়টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কৃত হবেঃ

1. **শ্রীকুমার দে** প্রযত্নে, হরিনারায়ণ ঘোষ, লক্ষ্মীনারায়ণ কলোনী, পোস্ট—নবপল্লী, বারাসত, উত্তর 24-পরগনা। 2. **প্রদীপ দাস** প্রযত্নে, করুণাময় দাস, গ্রাম—উটপাথার, পোস্ট—নিমপুরা, মেদিনীপুর। 3. **তন্ময় মহাপাত্র**, 56/F, বেলেঘাটা মেন রোড, কলকাতা-700010।

জুন '87-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড-I-এর সর্বাধিক নয়টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছেঃ

নদীয়াঃ সুধাংশু সরকার। **বাঁকুড়াঃ** রূপাঞ্জন সাহা।
মালদহঃ মানসী হাজরা চৌধুরী।

জুন '87-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড-II-এর সর্বাধিক নয়টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কৃত হবেঃ

1. **দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য** প্রযত্নে, দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য, গ্রা+পো—বেথুয়াডহরি, নদীয়া। 2. **অনুপম সরকার** কাঁটাপুকুর, পো—মগরা হুগলী-712148। 3. **শর্বরী দাস** প্রযত্নে, নিত্যানন্দ দাশ, 16, চ্যাটার্জী পাড়া লেন, পোঃ—হিন্দমোটর, হুগলী।

জুন '87-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড-II-এর সর্বাধিক নয়টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছেঃ

কলকাতাঃ সৌতি দত্ত, মহুয়া ঘোষ, সুশান্তকুমার চক্রবর্তী, সুদীপ দত্ত-বণিক, জয়া দেব, দীপঙ্কর ব্যানার্জী, নির্মলকুমার সোম।
হাওড়াঃ পিয়ালী ব্যানার্জী, অভিজিৎ খাঁড়া।
হুগলীঃ শান্তনু পাল, কন্যাশ্রী মুখোপাধ্যায়, সৌম্য ভট্টাচার্য, অনিরুদ্ধ গুপ্ত।
বর্ধমানঃ অনির্বাণ গুহ, রক্তিম মুখার্জী, মৌ দত্ত।
মেদিনীপুরঃ তিতাস বেরা, পুলিন বিহারী সাউ, তাপসকুমায় মাইতি, রাজদীপ দাস।
নদীয়াঃ দীপান্বিতা চক্রবর্তী, অচিন্ত্যকুমার বিশ্বাস।
বাঁকুড়াঃ রাহুলকুমার সামন্ত।
পুরুলিয়াঃ অলককান্তি দেব।
পঃ দিনাজপুরঃ কল্লোল রায়, প্রণব রায়, ইন্দ্রনীল বসু।

জুন '87-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড-III-এর সর্বাধিক আটটি-প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে একজন মাত্র পুরস্কৃত হবেঃ

উৎপল শেঠ বাঁশবেড়িয়া কুণ্ডুগলি, রক্ষাকালীতলা, পোঃ—বাঁশবেড়িয়া, হুগলী।

জুন '87-এ প্রকাশিত আই কিউ টেস্টের সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে দশজন সার্টিফিকেট পাবে :

1. সুদীপ্ত দত্ত বণিক
প্রযত্নে, সুবলচন্দ্র দত্ত বণিক
17/2, ডায়মণ্ডহারবার রোড
কলকাতা-700 038

2. দেবজ্যোতি দেবনাথ
প্রযত্নে, বীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ
9, ডঃ এস. পি. মুখার্জী রোড
বেলঘরিয়া, কলকাতা-700056

3. সুব্রতকুমার মণ্ডল
প্রযত্নে, শশিভূষণ মণ্ডল
গ্রাম—দুর্গাপুর, পো—বগুলা, নদীয়া।

4. দীপান্বিতা চক্রবর্তী
প্রযত্নে, জে চক্রবর্তী
গভঃ মিল্ক চিলিং প্ল্যান্ট -
পো – ফুলিয়া কলোনী, নদীয়া।

৫. তপনকুমার বসাক
প্রযত্নে, আনন্দমোহন বসাক
গ্রাম—2নং নূতন ফুলিয়া মাঠ পাড়া,
পোঃ—ফুলিয়া কলোনী, নদীয়া

6. প্রদীপকুমার করণ
প্রযত্নে, মুরারী করণ
গ্রাম—উত্তর রায়পুর, পো—দক্ষিণ রায়পুর বজবজ,
দঃ 24 পরগনা-743318।

7. নন্দিনী চক্রবর্তী
312, গাঙ্গুলী বাগান
নাকতলা, কলকাতা-700047।

8. রাজেশ গিরি
প্রযত্নে, কে. এল. সিনৃহা
স্কুলডাঙ্গা, বাঁকুড়া-722101।

9. তমালী সাহা
প্রযত্নে, শরৎকুমার গরাই
গুসকরা, বর্ধমান।

10. চঞ্চল বসু
24/4, নারায়ণচন্দ্র সেন লেন
হাওড়া—711106

যে বইটি শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রীই নয় প্রতিটি শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবকগণের পক্ষেও এককথায় অপরিহার্য্য

ইংরেজী নিয়ে নবম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা আজ প্রায় দিশেহারা। প্রশ্নপত্রের ধরণ সম্পর্কে কেউই ওয়াকিবহাল নয় বলেই এই বিভ্রান্তি। সকল বিভ্রান্তি দূর করতেই আমাদের একনিষ্ঠ প্রয়াস।

TEST YOURSELF

[Sample Question Papers & Answers with Desk Work]

by **AN OXFORD GRADUATE**
Under the Editorship of **Prof. BANERJEE**
• For class IX •

বইটিতে 15 সেট নমুনা প্রশ্নপত্র দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে মাত্র 5টি সেটের পূর্ণাঙ্গ উত্তর (প্রয়োজনীয় নোটসহ) করে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে— কিভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তর করতে হবে। বাকী 10টি সেট-এর উত্তর ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের করতে হবে— এবং সেটি বইয়ের ভিতরেই Desk Work হিসাবে। পরিচয়পত্র সাপেক্ষে প্রতিটি স্কুলের নবম শ্রেণীর প্রথম স্থানাধিকারীকে বিনামূল্যে বইটি দেওয়া হচ্ছে। দাম মাত্র বারো টাকা।

EDUCATIONAL ENTERPRISE
2, Ramnath Biswas Lane, Calcutta-9
. Phones : 35-0549, 35-3881, 32-6165.

অটোগ্রাফসহ গ্রন্থ উপহার

মে 87 সংখ্যা থেকে কুইজকনটেস্ট তিনটি পর্যায়ে প্রকাশিত হচ্ছে। VI VII-VIII; IX-X, XI-XII। ফটো কুইজ আলাদা ভাবে থাকছে না।

সবকটি প্রশ্ন বা সর্বাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দানের ভিত্তিতে (আগে আসার ভিত্তিতে) প্রথম তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। তিনজনেরই পুরস্কারের মূল্যমান সমান।

আই-কিউ-টেস্টের সফল উত্তর দাতাদের আগে আসার ভিত্তিতে 10টি সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।

আগস্ট সংখ্যার কুইজ কনটেস্টের উপহার

গ্রেড—1
অমরনাথ রায়ের
সায়েন্স এক্সপেরিমেন্টস

গ্রেড—2
ক্ষিতিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের
লুপ্তধন

গ্রেড—3
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প

প্রতিযোগিতার কুপন

কুইজ কনটেস্ট—গ্রেড-1/2/3 এবং আই কিউ টেস্টের উত্তরের সঙ্গে এই কুপনটি কেটে পাঠাতে হবে।

আমি..
....
ঠিকানা ....
....
বয়স.................. শ্রেণী ....
বিদ্যালয়ের নাম.........................
....
....

আই কিউ টেস্ট/কুইজ কনটেস্ট গ্রেড 1/2/3-এ উত্তর পাঠালাম।

ঃ সাউণ্ড সুইচিং সিস্টেম ঃ

নির্মলেন্দু বিকাশ পাত্র

CIRCUIT DIAGRAM

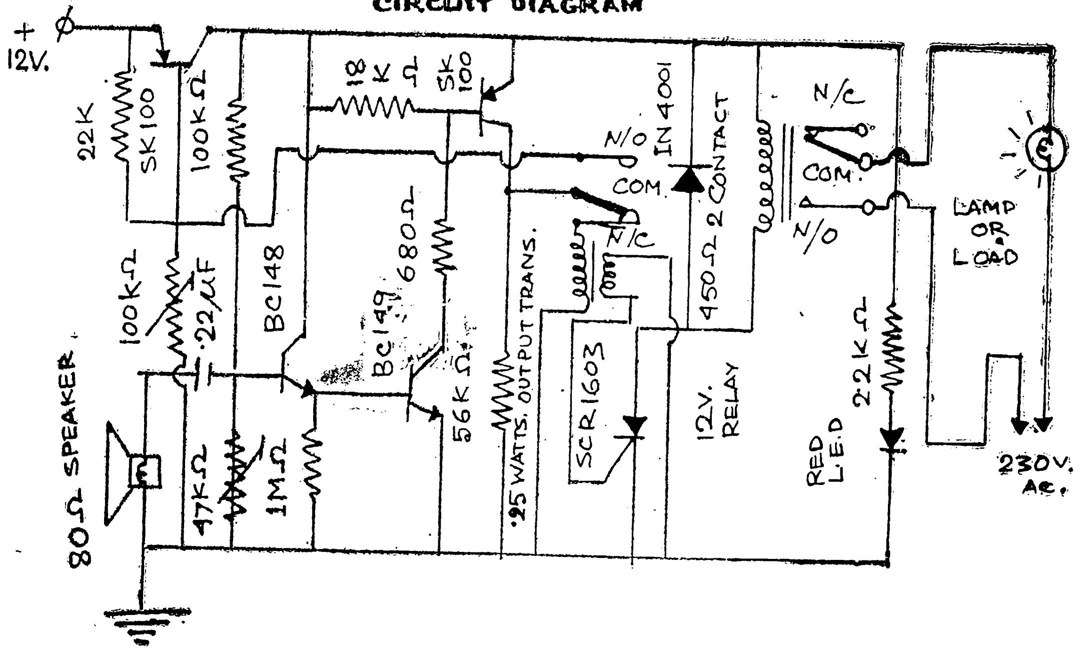

এতদিন আমরা লাইট বা ঐ জাতীয় জিনিস সুইচের সাহায্যে অন অফ করিয়েছি। আজ তোমাদের এমন একটি সার্কিট দেখিয়ে দেব যাতে কেবলমাত্র হাততালির সাহায্যে তোমরা লাইট জ্বালাতে বা নেভাতে পারবে।

এবারের সার্কিটে তোমরা একটা নতুন জিনিস লক্ষ্য করছ SCR (Silicon Controlled Rectifier) 1603, এটার গেট (gate) নামক পয়েন্টে গেন একবার দিলেই সুইচের মতো অন হয়ে যাবে। এই বিশেষত্বকে কাজে লাগিয়েই আমরা হাততালির শব্দ এ্যামপ্লিফাই করে রিলে অপারেট করছি।

এখন চটপট সার্কিট ডায়াগ্রাম দেখে ভেরোবোর্ডে মডেলটি করে ফেল। এবার মডেল কমপ্লিট হলে মেইনের সাথে বাল্বের কানেকশন সম্পূর্ণ কর। সার্কিটটা এ্যালি-মিনেটারে চালানো সবচেয়ে ভাল।

এবার স্পীকারকে ঘরের কোন উঁচু জায়গায় আটকিয়ে হাততালি দিলেই লাইট জ্বলে উঠবে এবং পরে আবার হাততালি দেবার সাথে সাথে আলো নিভে যাবে।

গ্রাম + ডাকঘর—চামরাইল, জেলা—হাওড়া।

জয়ন্ত দত্ত সঙ্কলিত

নিজে নিজে কর

তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে ॥ দাম ১০৲

প্রায় অর্ধশত মডেলের সার্কিট ডায়াগ্রাম, নির্মাণ প্রণালী ও ব্যাখ্যা।

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ • 86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-9

আতস-জল

অপরাজিত বসু

আতস-কাচ দেখেছ তো ? যা দিয়ে ছোট্ট লেখা পড়া যায়। নিশ্চয়ই দেখে থাকবে। তাই বলে আতস জল? কেউ দেখনি তো !

দেখ, কেমন চট্‌পট্‌ জল দিয়ে আসত-কাচ বানিয়ে ফেলি। জল দিয়ে বানানো আসত-কাচের নাম "আতস-জল।"

খুব ছোট্ট একটা রিং নাও। না পেলে, তোমার ছোট্ট কড়ে আঙুলের আংটি নাও। তাও না পেলে নিদেন পক্ষে একটা সেফ্‌টি-পিন নাও। রিং-এর বা আংটির বা সেফ্‌টি পিনের পিছনের গোলের বাঁকের মধ্যে সাবধানে এক ফোঁটা পরিষ্কার জল লাগিয়ে দাও। ব্যস, তাতেই হয়ে গেল তোমার আতস-জল। ওই দিয়েই ক্ষুদে ক্ষুদে লেখা পড়তে পারবে।

ক্ষুদে লেখার বেশ কাছে জলের ফোঁটা লাগানো রিং নিয়ে এস। তারপর জলের ফোঁটার মধ্য দিয়ে তাকিয়ে দেখ তো। কেমন, ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষর বেশ বড় দেখাচ্ছে তো ! পড়তে আর অসুবিধা নেই।

কাচই বল, আর জলই বল, সবই পরিষ্কার। তাদের মধ্য দিয়ে আলোর যাতায়াতের কোন অসুবিধা নেই। বাতাসের মধ্য দিয়ে আলো ছুটতে ছুটতে যখন কাচে বা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন আলো তার গতিমুখ বদল করে—এর নাম আলোর প্রতিসরণ।

কাচ বা জল-দুইই এ কাজে প্রায় সমান দক্ষ। দু'জনের আলোকে বাঁকানোর ক্ষমতা প্রায় সমান। প্রতিসরণের জন্যই আতস-কাচের কদর। তাই কাচের বদলে কেউ যদি জল দিয়ে আতস-কাচ বানায় তাহলে অবাক হবার নেই, আতস-জল ঠিকই তার কাজ করতে পারবে।

এবার, তোমরা নিজের আতস-জল বানিয়ে ফেল তো।

জ্ঞান ও আনন্দের আশ্চর্য সমীকরণ

শারদীয়

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

এ থাকবে

- 9টি বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প ও উপন্যাস
- 2টি বিজ্ঞান ও ইতিহাস নির্ভর প্রবন্ধ
- 10টি বিশেষ প্রবন্ধগুচ্ছ
- 6টি রঙিন ফিচার
- 2টি দীর্ঘ চিত্র কাহিনী
- 2টি অনুবাদ গল্প
- 5টি মডেল : নিজে নিজে কর
- 10টি সায়েন্স এক্সপেরিমেণ্টস
- 5টি জীবন চরিত
- 3টি নির্বাচিত প্রবন্ধ
- 5টি প্রতিযোগিতা ও অসংখ্য পুরস্কার

এ ছাড়া অসংখ্য ছড়া, কবিতা, কার্টুন, কমিকস ও অন্যান্য আকর্ষণ

এজেণ্টদের প্রতি

শারদীয় কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান বেরোবে আনুমানিক সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে। এজেণ্টদের সংখ্যা পিছু Rs. 5/- অগ্রিমসহ 1লা সেপ্টেম্বরের মধ্যে অর্ডার বুক করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

তোমার কপির জন্য এখনই হকার ও কাগজওয়ালাকে বলে রাখো

সারকুলেশন ম্যানেজার : কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

বিজ্ঞানের ডায়েরী–আগস্ট

বিমান বসু

1 আগস্ট 1874, ফ্রান্সের স্ট্রাসবুর্গ (Strasbourg) শহরে রসায়নবিদ্ ওথমার জাইডলার (Othmar Zeidler) এই দিন ডিডিটি (DDT) আবিষ্কারের ঘোষণা করেন। ঐ নতুন যৌগিকটি তিনি তৈরি করেছিলেন

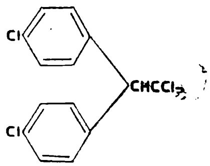

ক্লোরোবেনজিন (Chlorobenzene), ক্লোরাল (Chloral) ও সালফিউরিক অ্যাসিডের রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা। ডিডিটির কীটনাশক গুণ অবশ্য জানতে পারা যায় প্রায় 65 বছর পর 1939 সালে। ঐ গুণ আবিষ্কার করেন সুইশ বিজ্ঞানী পল মুয়েলার (Paul H. Mueller)। ঐ অবিষ্কারের জন্য মুয়েলারকে 1948 সালে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে ডিডিটি'র ব্যবহার বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষকে ম্যালেরিয়া ও টাইফাসের মত মারাত্মক রোগের হাত থেকে রক্ষা করেছে। অবশ্য পরিবেশের ওপর কিছু দুষ্প্রভাবের দরুন সাম্প্রতিক কালে ডিডিটি'র ব্যবহার অনেক কমে গেছে।

2 আগস্ট 1861, অধুনা বাংলাদেশের খুলনা জেলার রাড়ুলি গ্রামে এই দিন বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানসাধক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় জন্ম গ্রহণ করেন। রসায়নের ক্ষেত্রে প্রফুল্লচন্দ্রের সবচেয়ে উল্লেখনীয় অবদান মার্কিউরাস্ নাইট্রাইট (mercurous nitrite) এর আবিষ্কার।

পারদঘটিত যৌগটি তিনি 1895 সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে গবেষণা চালানোর সময় আবিষ্কার করেন। তাঁর আর একটি বড় কীর্তি তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ A History of Hindu Chemistry। হাতে লেখা পোকায় কাটা প্রাচীন পুঁথিপত্র থেকে তিনি এই ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র এক দিকে যেমন এদেশে রসায়ন চর্চার পথিকৃৎ ছিলেন, অপরদিকে তিনি ব্যবসা-বিমুখ বাঙালীকে স্বাধীন ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় গড়ে উঠেছিল সে সময় এশিয়ার বৃহত্তম ভেষজ দ্রব্য তৈরির প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্। দেশীয় গাছ-গাছড়া থেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ওষুধ তৈরির দৃষ্টান্ত এদেশে বেঙ্গল কেমিক্যাল'ই প্রথম স্থাপন করেছিল।

5 আগস্ট 1914, আমেরিকার ওহায়ো (Ohio) শহরে এই দিন বিশ্বের সর্ব প্রথম রাস্তায় যানবাহন নিয়ন্ত্রণকারী বাতি বা ট্র্যাফিক লাইট্ এর ব্যবহার শুরু হয়।

6 আগস্ট 1945, এইদিন জাপানের হিরোশিমা শহরের ওপর সর্ব প্রথম আণবিক বোমা ফেলা হয়। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে প্রায় পুরো শহরটাই ধ্বংস হয়ে যায়। ঐ ধ্বংসলীলায় প্রায় আশি হাজার বাসিন্দা প্রাণ হারায়। পরে বোমা থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাবে আরও প্রায় ষাট হাজার মানুষ মৃত্যু বরণ করে।

8 আগস্ট 1901, কণিকা ত্বরণের জন্য 'সাইক্লোট্রন'

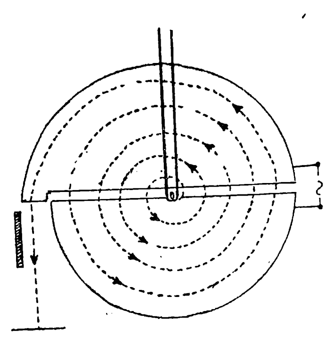

(Cyclotron) যন্ত্রের আবিষ্কারক আর্নেস্ট অরল্যাণ্ডো লরেন্স (Ernest Orlando Lawrence) এই দিন আমেরিকার ক্যান্টন (Canton) শহরে জন্মগ্রহণ করেন। 1939

সালে সাইক্লোট্রন আবিষ্কারের জন্য তাঁকে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

10 আগস্ট 1893, এই দিন জার্মানীর রুডল্‌ফ্‌ ডিজেল (Rudolf Diesel) তাঁর আবিষ্কৃত ডিজেল ইঞ্জিন সর্বপ্রথম চালু করেন। সাধারণ পেট্রল ইঞ্জিনের তুলনায় ডিজেল ইঞ্জিনের সুবিধে এই যে, এতে কোনও স্পার্ক প্লাগ লাগে না। তাছাড়া এতে ব্যবহারের ডিজেলও পেট্রলের চেয়ে অনেক সস্তা। ডিজেলের ঐ আবিষ্কার বিশ্বে যান-বাহনের ক্ষেত্রে এক যুগান্তর এনে দিয়েছে।

12 আগস্ট 1848, রেল ইঞ্জিনের আবিষ্কর্তা জর্জ স্টিফেনসন এই দিন পরলোক গমন করেন।

21 আগস্ট 1977, 'ভয়েজার —2' (Voyager —2) গ্রহ যানকে এই দিন আমেরিকার কেপ কেনেডি থেকে বৃহস্পতি গ্রহ অভিমুখে ছাড়া হয়। প্রায় দেড় বছর পর 9 জুলাই 1979 তারিখে গ্রহ-যানটি বৃহস্পতির 7,14,000 কিলোমিটার দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে যায় ও বহু রঙীন ছবি ও বৈজ্ঞানিক তথ্য পাঠায়। বৃহস্পতির পর, 1981 সালের 25 আগস্ট ভয়েজার-2 শনির পাশ কাটিয়ে চলে যায় ও বহু ছবি ও তথ্য পাঠায়। এর পর, 1986 সালের 24 জানুয়ারী ভয়েজার-2 সৌরমণ্ডলের সপ্তম গ্রহ ইউরেনাসে পৌঁছয়। সেখান থেকেও বহু অজানা তথ্য ও ছবি পাঠানোর পর গ্রহযানটি নেপচুন গ্রহ অভিমুখে যাত্রা করেছে। 1989 সালে গ্রহযানটির নেপচুনের কাছে পৌঁছনোর কথা।

24 আগস্ট 1939, বিশ্বের প্রথম জেট বিমান 'হাইঙ্কেল্‌ 178' (Heinkel He 178) এই দিন প্রথম আকাশে ওড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানীতে গোপনে ঐ বিমানটি তৈরি করা হয়।

25 আগস্ট 1966, এই দিন চন্দ্রযান 'অরবিটার-1'

(Orbiter-1) সর্ব প্রথম চাঁদ থেকে পৃথিবীর ছবি তুলে পাঠায়।

27 আগস্ট 1962, অন্য কোনও গ্রহের উদ্দেশ্যে পাঠানো সর্বপ্রথম মহাকাশযান 'মেরিনার-2' (Mariner-2) কে এই দিন শুক্রগ্রহ অভিমুখে ছাড়া হয়।

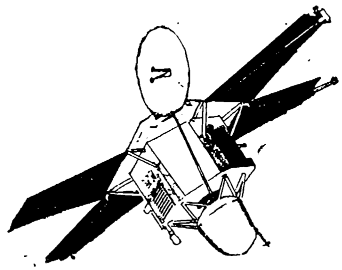

গ্রহযানটি প্রায় সাড়ে তিন মাস পর, 14 ডিসেম্বর তারিখে শুক্রগ্রহের প্রায় 7 লক্ষ কিলোমিটার দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় গ্রহটি সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য পাঠায়।

পুজো সংখ্যায়

পাঁচটি প্রতিযোগিতা

সুপার ক্যুইজ কনটেস্ট ॥ আই কিউ টেস্ট ॥ অঙ্কের ধাঁধা ॥ চোখের ধাঁধা ও ফটো ক্যুইজ

এবং অসংখ্য পুরস্কার

বলতে পারো কেন ?

সুধাংশু পাত্র

গতমাসের নির্বাচিত প্রশ্নের উত্তর

আকাশ কেন নীল ?

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ভাসমান বস্তুকণা সূর্যরশ্মির সবচেয়ে কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বেগুনী ও নীল আলোকের বিক্ষেপণ ঘটায়। আমাদের চোখ বেগুনী অপেক্ষা নীলের প্রতি অধিক সংবেদনশীল। উক্ত কারণে আকাশের নীল রঙটাই আমাদের চোখে পড়ে।

এ মাসের নির্বাচিত প্রশ্ন

ঢেঁকুর ওঠে কেন ?

জানতে চেয়েছো (1) কে. পি. রায়, 2/6 নাগার্জুন এক্সটেনসন রোড, দুর্গাপুর-5।
(2) উৎপল মণ্ডল, রাধানগর, হুগলী।

প্রঃ মদ খেলে শরীরের কি ক্ষতি হয় ? যদি হয়, তাহলে ওষুধে মদ থাকে কেন ? (1) কুন্তল রেজ, মন্তেশ্বর, বর্ধমান। (2) সম্পদ, জয়দেব, অর্ঘ্য বিশ্বজিৎ, শম্পা, মধুমিতা তৃপ্তি, গীতা প্রভৃতি আরও অনেকে। কাঁথি, মেদিনীপুর। (3) স্বরূপ সাধুখাঁ, কেশবপুর, হুগলী।

উঃ মদ শরীরের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। মদ মাত্রেই অ্যালকোহল আর ঐ অ্যালকোহলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সে খুব তাড়াতাড়ি রক্তের সঙ্গে মিশতে পারে।

পাকস্থলীতে অ্যালকোহল অতি সামান্যই বিশোষিত হয়। একরকম সবটাই বিশোষিত হয় ক্ষুদ্রান্ত্রে। এটি ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে যকৃতে গেলে এক ধরনের উৎসেচকের প্রভাবে জারিত হয় এবং প্রথমে অ্যাসিট্যালডিহাইড, পরে অ্যাসিটেট এবং শেষে গঠন করে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল। এতে যকৃতে ল্যাকটেট নামক উৎসেচকের ক্ষরণ ভয়ানক ভাবে বেড়ে যায় এবং উৎপন্ন হয় ফ্যাটি অ্যাসিড ও ইউরিক অ্যাসিড। উক্ত কারণগুলির জন্যই রক্তে অম্ল ও ক্ষারের সমতা হ্রাস পায় এবং শারীরবৃত্তীয় কাজগুলোকে ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত করে। অপরদিকে উক্ত কারণে রক্তে অ্যালকোহল সরাসরি প্রবেশেরও ক্ষমতা রাখে।

দেখা গেছে কোন সময়ে শতকরা 0·03 ভাগের মত অ্যালকোহল রক্তে প্রবেশ করলে বিশেষ ক্ষতি হয় না। ওষুধের মাধ্যমে যে পরিমাণ অ্যালকোহল রক্তে প্রবেশ করে তা উপরোক্ত পরিমাণ অপেক্ষা অনেক কম। এই পরিমাণ একটু বাড়লেই ভয়ঙ্কর সব ক্ষতির সম্ভাবনা। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে অ্যালকোহল শতকরা 0·04 থেকে 0·06 ভাগের মত রক্তে প্রবেশ করলে শরীরে প্রচণ্ড অবসাদ আসে। 0·1 ভাগ হলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শিথিলতা এবং 0·5 ভাগের মত হলেই জড়তা, মত্ততা, এমনকি কখনও কখনও মৃত্যুকেও ডেকে আনে।

অপরদিকে অতি কম পরিমাণ অ্যালকোহলও নিয়মিত গ্রহণ করতে থাকলে কিছুদিন পরে যকৃতের নানা ধরনের রোগ আসে, রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা হ্রাস পায়, মানসিক জড়তা আসে এবং পরিণামে ক্যান্সার হওয়ারও সম্ভাবনা। সাম্প্রতিক সমীক্ষাগুলি থেকে প্রমাণিত হয়েছে মদ্যপায়ীদের মধ্যে ক্যানসার অমদ্যপায়ীদের অপেক্ষ্য প্রায় 15 গুণ বেশি।

প্রঃ অনেকক্ষণ বসে থাকলে পা ঝিনঝিন করে কেন ? (1) সজল দাস, পারোই, মেদিনীপুর। (2) সব্যসাচী বিশ্বাস, গড়িয়া, কলি-84।

উঃ আমাদের শরীরের সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে স্নায়ু। শরীরের কোন অংশের স্নায়ুর উপর একনাগাড়ে কিছুক্ষণ ধরে চাপ পড়লে প্রতিবর্ত ক্রিয়া স্বরূপ তার অগ্রবর্তী অংশের উপর একধরনের সংবেদনের সৃষ্টি হয়। অনেকক্ষণ পা গুটিয়ে বসে থাকলে তথাকার স্নায়ুসমুহের উপর ক্রমাগতভাবে চাপ পড়তে থাকায় যে সংবেদনের সৃষ্টি হয় তাকেই আমরা ঝিনঝিন বলি।

প্রঃ মানুষের দেহে আঘাত লাগলে ফুলে ওঠে কেন ? (1) শিপ্রা নাগ, অম্বিকানগর, 24-পরগনা। (2) তাপস কর, সোলপাট্টা, মেদিনীপুর।

উঃ আঘাত লাগলে দেহত্বকের তলায় কোষকলাগুলো থেঁতলে যায়। তাতে কোষের আবরণের ভেদ্যতা অনুযায়ী কিছু কিছু রস সবসময় কোষকলার মধ্যে নিঃসৃত হতে থাকে। সেই নিঃসৃত রস কিন্তু সেইখানে অবস্থান করে না, লসিকানালী দিয়ে হৃদযন্ত্রের দিকে ফিরে যায়। আঘাত লাগার ফলে কোষের আবরণের ভেদ্যতা নষ্ট হওয়ায় কোষকলা থেকে

স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি রস নির্গত হয় এবং এত রসকে লসিকানালী বহন করে নিয়ে যেতে অসমর্থ হয়। এর ফলে নির্গত রস সেইখানে জমা হয়ে থাকে এবং স্থানটি ফুলে ওঠে।

প্রঃ আমাদের হাসি বা কান্না পাওয়ার কারণ কী? প্রবীর জানা, জহর সাহা, হাওড়া।

উঃ হাসি-কান্নার মূলে আছে আবেগ। গত জুলাই সংখ্যায় মন ও আবেগ সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। কষ্ট করে উত্তরটা খুঁজে নিও।

প্রঃ 5°C উষ্ণতাবিশিষ্ট জলের ঘনত্ব সর্বাধিক কেন? (1) নির্মাল্য কর, ভি. কে. নগর, দুর্গাপুর-20। (2) শঙ্কর কুণ্ডু, বোলপুর বীরভূম।

উঃ উষ্ণতা বৃদ্ধি হতে থাকলে যে কোন তরলের আয়তনের প্রসার ঘটে এবং ঘনত্বও কমে যায়। কিন্তু জলের ক্ষেত্রে এই নিয়মের একটু ব্যতিক্রম আছে। দেখা গেছে, 0°C উষ্ণতায় কিছু পরিমাণ জলকে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করতে থাকলে 4°C উষ্ণতা বৃদ্ধি পর্যন্ত আয়তনের প্রসার না ঘটে অল্প অল্প সঙ্কুচিতই হতে থাকে। 4°C উষ্ণতায় এই সঙ্কোচন হয় চূড়ান্ত। তাই উক্ত তাপমাত্রায় তার ঘনত্ব সর্বাধিক। অবশ্য জলের তাপমাত্রা 4°C উষ্ণতা ছাড়িয়ে যতই বৃদ্ধি পাবে ততই অপরাপর সব তরলের মত এরও আয়তনের প্রসারণ ঘটে।

প্রঃ শব্দের বেগ শুষ্ক বায়ুতে ও আর্দ্র বায়ুতে একই হবে কি? সেখ মোহম্মদ শামীন, দক্ষিণ রাধানগর শ্রীগৌরাঙ্গ হাইস্কুল, দক্ষিণ 24 পরগনা।

উঃ না, অতি সামান্যই বৃদ্ধি পাবে। যেহেতু বায়ুর আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেলে ঘনত্ব কমবে এবং ঘনত্ব কমলেই শব্দের বেগ বাড়বে। তবে দেখা গেছে, আর্দ্রতা বৃদ্ধির জন্য শব্দের গতিবেগ বৃদ্ধির পরিমাণ খুব কম। এমনকি বাতাস জলীয় বাষ্পের দ্বারা একেবারে সম্পৃক্ত হয়ে পড়লেও শুষ্ক বায়ুর তুলনায় মাত্র 0·44 শতাংশ বৃদ্ধি পায়!

প্রঃ পৃথিবীতে সর্বপ্রথম বীজ থেকে উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়েছিল, না উদ্ভিদ থেকে বীজের? স্মরজিৎ নস্কর, বারুইপুর, দক্ষিণ 24-পরগনা।

উঃ পৃথিবীতে জীব ও উদ্ভিদ একই সঙ্গে যাত্রা শুরু করেছিল অতি ক্ষুদ্র এককোষী প্ল্যাংক্টন দিয়ে। কালক্রমে প্ল্যাংক্টনরা স্বভোজী উদ্ভিদ প্ল্যাংক্টন ও পরভোজী প্রাণী প্ল্যাংক্টন—এই দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। পণ্ডিতদের মতে ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে করতেই আজকের এই উদ্ভিদজগৎ (প্রাণিজগৎও)। ঐ ক্রমবিকাশের ধারায় এককোষী থেকে বহুকোষী, অপুষ্পক থেকে সপুষ্পক, একবীজপত্রী থেকে দ্বিবীজপত্রী এইভাবেই এসেছে উদ্ভিদ-জগৎ। আদিতে বীজ ছিল না।

প্রঃ আর্কিমিদিস সোনার মুকুট না ভেঙ্গে কেমন করে ওর খাদ আছে কিনা নির্ণয় করলেন. তা বুঝতে পারলাম ন। মীরকাশিম মণ্ডল ও শেরাব মোল্লা, গোবিন্দপুর, পাথরঘাটা, নদীয়া।

উঃ আর্কিমিদিস বিশুদ্ধ সোনা এবং সোনার মুকুটের উভয়ের আপেক্ষিক গুরুত্ব বার করেছিলেন। ফলে মুকুটের সোনায় খাদ আছে কিনা নির্ণয় করতে অসুবিধা হয়নি।

বিজ্ঞানের খবর

অন্য গ্রহে বুদ্ধিমান প্রাণী

এই বিরাট মহাকাশে অনেক গ্রহ আছে। পৃথিবীও একটা গ্রহ। এই পৃথিবীতে মানুষ ছাড়াও আছে অন্যান্য জীবজন্তু। মঙ্গল গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা তা নিয়ে নানান গবেষণা চলেছে। এখন বিজ্ঞানের যুগে মানুষ চাঁদে পর্যন্ত পাড়ি দিয়েছে। মহাকাশ যান চাঁদে পাঠিয়ে চাঁদের মাটি পর্যন্ত মানুষ তুলে এনেছে। অনেক দিন ধরে পৃথিবীর নানান প্রান্তের বিজ্ঞানীরা জানবার চেষ্টা করছেন যে মহাকাশের অন্যান্য গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব আছে কিনা। আমাদের ভারতীয় বিজ্ঞানী ডঃ জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকার মনে করেন যে ছায়াপথে যে সমস্ত গ্রহ রয়েছে তাতে প্রাণী আছে। আর সেখানকার প্রাণীরা খুবই বুদ্ধিমান। ঐ সব প্রাণী-দের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ করাটা হয়ত উচিত হবে না। কেননা তাঁর মতে এতে বিপদের সম্ভাবনা বেশি। ঐ সব গ্রহে যে সমস্ত প্রাণী আছে বলে ডঃ নারলিকার মনে করছেন তাঁর মতে তারা বিজ্ঞান ও কারিগরী দিক দিয়ে পৃথিবীর মানুষের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত হতে পারে। যোগাযোগের চেষ্টা করলে তারা হয়ত ঐ উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে।

মানুষ তবুও কিন্তু বসে নেই। অজানাকে জানবার জন্য তাই সমানে চালাচ্ছে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ।

বরুণ মজুমদার

কিশোর রচনাবলী

জগদীশচন্দ্র বসু ॥ কিশোর রচনা সমগ্র ২৫

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

কিশোর রচনা সমগ্র ৩০

প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥

শার্লক হোমস্ কিশোর সমগ্র ২৫

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ॥ রোমাঞ্চকর ২৫

মেঘনাদ সাহা ॥ কিশোর রচনা সঙ্কলন ১২

ভ্রমণ ও অভিযান

সুনির্মল বসু ॥ রোমাঞ্চের দেশে ৬

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

সুন্দরবনে সাত বৎসর ১০

ধীরেন্দ্রলাল চক্রবর্তী ॥ দুরন্ত যাত্রী ৮

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ॥ গঙ্গা যমুনা ৮

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ॥

আমাজনের অরণ্যে ৮

সুনির্মল রায় ॥ চাঁদের পাড়ি ৮

দেবব্রত চক্রবর্তী ॥ চক্রতীর্থের চমক ১০

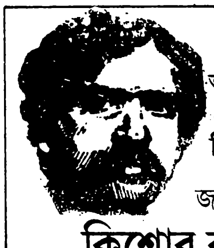

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর গল্প প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী ও চিঠিপত্রের মূল্যবান সঙ্কলন

জগদীশচন্দ্র বসু

কিশোর রচনা সমগ্র ২৫

কিশোর ক্লাসিক্‌স্

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ **তেপান্তর** ২০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ **কিশোর অপু** ২৫

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্দীপন পাঠশালা ১০

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ **ছোটদের কাজল** ১০

প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ **ঘনাদা বিচিত্রা** ২৫

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

টেনিদার অভিযান ২৫

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ **বাঙলার ডাকাত** ২৮

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অপুর ছেলেবেলা ১০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটদের অপরাজিত ১০

বুদ্ধি ও মেধা চর্চার জন্য

অমরনাথ রায় ॥ **নলেজ ক্যুইজ** ১০

অরূপরতন ভট্টাচার্য ॥ **গণিত ক্যুইজ** ১০

অমরনাথ রায় ॥ **সায়েন্স ক্যুইজ** ১০

অলক চক্রবর্তী ॥ **ফিজিক্স ক্যুইজ** ১০

অমরনাথ রায় ॥ **কেমিস্ট্রী ক্যুইজ** ১০

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প

লীলা মজুমদার ॥ কল্পবিজ্ঞানের গল্প ১৫

ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য ॥ লুপ্তধন ৮

ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য ॥ মেঘনাদ ১০

অদ্রীশ বর্ধন ॥ কিশোর সায়েন্স ফিকশন ১৫

ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য

তুষারলোকের রহস্য ৮

কারিগরী বিদ্যার প্রথম পাঠ

সহজ সরল ব্যাখ্যাসহ প্রায় অর্দ্ধশত মডেলের সচিত্র নির্মাণ প্রণালী

জয়ন্ত দত্ত সঙ্কলিত

নিজে নিজে কর ১০

সচিত্র জ্ঞানবিজ্ঞান

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ॥ **বিচিত্র বিজ্ঞান** ৮

অরূপরতন ভট্টাচার্য ॥ **যুক্তিতর্ক হেঁয়ালি** ৮

বিমান বসু ॥ **গ্রহ পরিচয়** ১২

পার্থসারথি চক্রবর্তী

মাটি থেকে আকাশে ১০

অমরনাথ রায় ॥ **সংখ্যা নিয়ে খেলা** ৮

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

বিজ্ঞানেরআকস্মিকআবিষ্কার ৮

অমরনাথ রায়

জ্ঞানবিজ্ঞানের মজার খেলা ১০

সাধন দাসগুপ্ত ॥ **আলো আরও আলো** ১৫

সাধন দাসগুপ্ত ॥ **রোমাঞ্চকর রসায়ণ** ১২

সাধন দাসগুপ্ত ॥ **ভাষা গণিত** ২০

সিদ্ধার্থ ঘোষ

অঙ্কের ম্যাজিক খেলার লজিক ১৫

স্যাম লয়েড ও লুইস ক্যারোলের ধাঁধা ১০

No 37390/81 KISHORE JNAN-BIJNAN 7th Yr Vol – 4· AUGUST 1987/Regd.No.WBEC/255

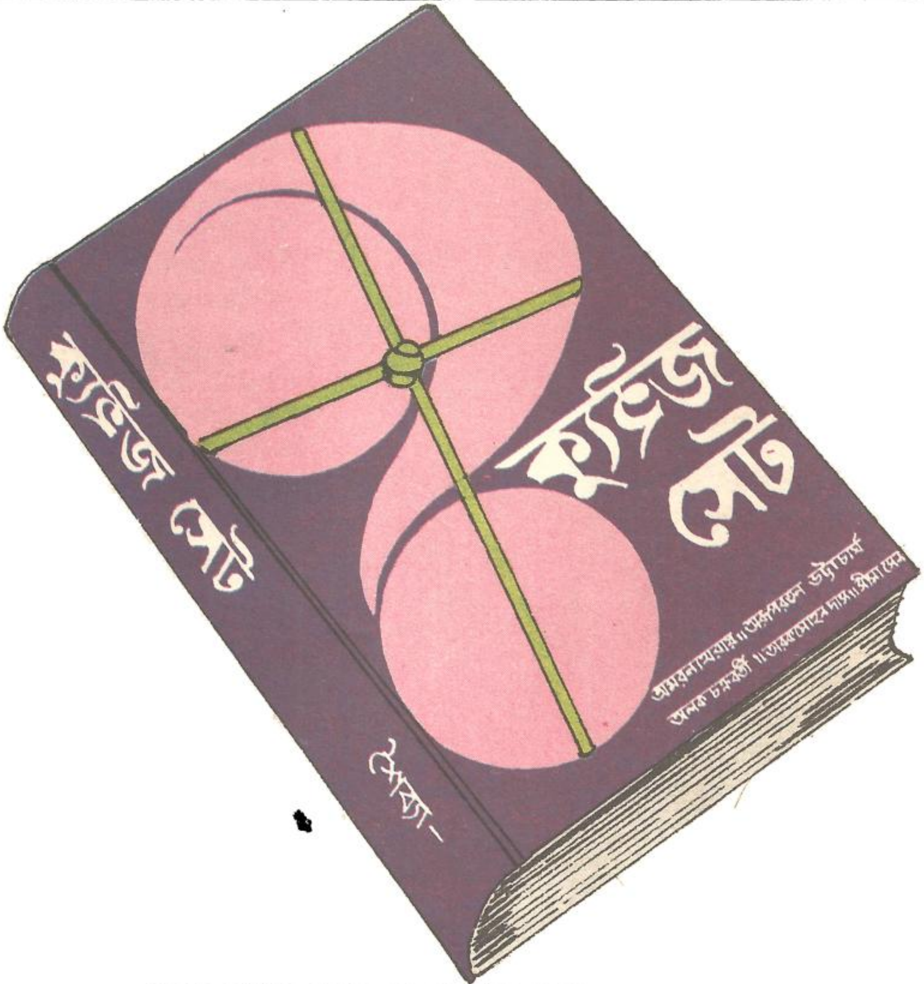

গ্রন্থসূচী : সায়েন্স ক্যুইজ ● গণিত ক্যুইজ ● নলেজ ক্যুইজ ফিজিক্স ক্যুইজ ● কেমিস্ট্রী ক্যুইজ ● লাইফ সায়েন্স ক্যুইজ

লেখকসূচী : অমরনাথ রায় ● অরূপরতন ভট্টাচার্য ● অলক চক্রবর্তী ● তারকমোহন দাস ও সীমা সেন

ক্যুইজ সেট

প্রকাশিত হয়েছে
৬টি বইয়ের
সেট ৫০,

স্টল নং ৫১০
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৯ থেকে প্রকাশিত এবং ৮এ দীনবন্ধু লেন কলিকাতা ৬ নিউ জয়কালী প্রেস থেকে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ ও রঙিন পাতা মুদ্রণে ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা ১২

দাম : 4·00 টাকা।